হযরতজী

মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রাহঃ)

[সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী লিখিত "মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস আওর উন্‌কি দ্বীনি তাহরীক" গ্রন্থ অনুসরণে]

মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা।

মদীনা পাবলিকেশান্স

লেখকের আরজ

ইসলাম ও মুসলিম সমাজের জন্য যুগে যুগে আলেম সমাজের সীমাহীন কুরবানী এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিরামহীন সাধনার ধারাবাহিকতা ইসলামের প্রথম যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ইমামুল-হিন্দ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর জেহাদী চিন্তাধারার একজন বলিষ্ঠ অনুসারী, যুগ শ্রেষ্ঠ তাপস হযরত মাওলানা ইলয়াস রাহমাতুল্লাহে আলাইহের নজিরবিহীন প্রচেষ্টার সোনালী ফসল তবলীগী জামাত ও উলামায়ে হাক্কানীর সেই ধারাবাহিক সাধনারই একটি উল্লেখযোগ্য উত্তরাধিকার মাত্র। এই জামাত আজকের বিশ্বে নতুন এক বিস্ময় এবং সারা মুসলিম জাহানে নূতন আশার সৃষ্টি করিয়াছে।

বিংশ শতকের ব্যাপক জড়বাদিতার সয়লাবে প্লাবিত দুনিয়ার মানুষের সম্মুখে দ্বীনদারী ও রূহানিয়াতের নির্ভেজাল শিক্ষাকে বলিষ্ঠভাবে পুনর্জীবিত করিয়া মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রাহঃ) আজ সারা দুরিয়ার চিন্তাশীল মানুষেরই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম জনগণের মধ্যে সাহাবায়ে-কেরামের জীবন-সাধনাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস আত্মার জগতে নতুন এক উত্তাপ এবং নতুন এক প্রাণবন্যার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

দারুল-উলুম দেওবন্দের কৃতী ছাত্র, সমসাময়িক আলেম সমাজের মাথার তাজ মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস ছিলেন প্রচারবিমুখ নিরলস একজন কর্মসাধক। এ কারণেই বিশ্বপ্লাবী একটি আন্দোলনের প্রবর্তক হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার খুব কাছের মানুষ এই দেশের জনগণের সম্মুখে তাঁহার বিস্তারিত জীবনকথা আজও অজানার গাঢ় পর্দায় আবৃত রহিয়াছে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মহান কর্মীপুরুষের প্রদর্শিত পথে উদ্দীপিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার জীবন এবং আন্দোলনের মর্মকথা সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী সমাজের বিরাট এক অংশের মধ্যেও অজ্ঞতাসুলভ অনেক ভুল ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়।

এক সময় ছিল, যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এই দেশের সর্বহারা অজ্ঞ মানুষকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার অপকৌশল হিসাবে হাক্কানী উলামাগণের সম্পর্কে নানাপ্রকার অপপ্রচারের ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া দিত। এই দেশেরই একদল ভাড়াটিয়া লোক সাম্রাজ্যবাদের সেই ইবলিসী চক্রান্তের আড়কাঠিরূপে ব্যবহৃত হইত। আজও সেই ইবলিসদের প্রেতাত্মারা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নানা ঘৃণ্য তৎপরতায় নিয়োজিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই চক্রান্ত হইতে বাংলার সরলপ্রাণ মানুষকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে আমাদের ব্যাপক সাধক উলামাগণের নিখুঁত জীবন-ইতিহাস প্রচার করিবার কোন সুপরিকল্পিত উদ্যোগ কোথাও দেখা যাইতেছে না। এই ব্যর্থতার ফলশ্রুতি আজকের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও দুঃখজনক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতেছে। শুধু অজানার কারণেই অনেক শিক্ষিত লোকের দ্বীন-ঈমান এক শ্রেণীর ধূর্ত ধর্ম ব্যবসায়ীর সহজ শিকারে পরিণত হইতেছে।

বাংলার মুসলিম সমাজের এই বেদনাদায়ক অভাবটি পূরণ করিবার উদ্বেলিত আকাঙ্ক্ষাতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার ক্ষমতা ও যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহর ওলীগণের রূহানী ফয়েজ লাভ করিবার আশায় আমি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আল্লাহর তওফীক হইলে আমি একে উপমহাদেশের প্রাতঃস্মরণীয় সব কয়জন হাক্কানী আলেমের জীবনচরিত্র দেশবাসীর খেদমতে পেশ করার ইচ্ছা রাখি। এই ব্যাপারে পাঠকগণের দোয়া ও সহযোগিতাই হইবে আমার প্রধান অবলম্বন। আল্লাহ্ আমাদের সকলের সর্বপ্রকার নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন!!

"হযরতজী মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস" নামক এই পুস্তকটি লিখিতে গিয়া আমি সর্বাংশে হযরতের অন্তরঙ্গ সাথী উপমহাদেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিন্তাবিদ মনীষী মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী লিখিত কিতাবের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। আমার এই বই হযরতজী সম্পর্কে মাওলানা নদভী লিখিত অত্যন্ত গবেষণামূলক সেই পুস্তকটির আংশিক অনুবাদ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, এর মধ্যে আমার নিজের পক্ষ হইতে উল্লেখযোগ্য নতুন কোন তত্ত্ব বা তথ্য সংযোজন করা সম্ভব হয় নাই।

মাওলানার লিখিত পুস্তকের শেষাংশে যেখানে তবলীগী তাহ্‌রিকের দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে সূক্ষ্ম আলোচনা করা হইয়াছে, সেই অংশটি ইচ্ছাকৃতভাবেই বাদ দিয়াছি। কারণ, হযরত মাওলানা ইলয়াস এবং তাঁহার আন্দোলন সম্পর্কে এখনও এই দেশে প্রাথমিক পরিচয়েরই যেখানে অভাব, সেখানে পরিচয় গাঢ় হওয়ার আগেই সূক্ষ্ম দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। তবে পরিচয় কিছুটা গাঢ় হওয়ার পর পরবর্তী সংস্করণে অথবা পৃথক একটি খণ্ডে সেই আলোচনাও পরিবেশন করার ইচ্ছা অবশ্যই আছে। হযরত মাওলানার তাহ্‌রীক সম্পর্কিত আমার ধারণা একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের। এই তাহ্‌রিকের মাধ্যমে আমার চোখের সামনেই যেভাবে অগণিত কঠিন হৃদয় লোক দ্বীনের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এক একজন মোজাহেদে পরিণত হইতে

দেখিয়াছি, তাতে আমি মুগ্ধ-বিস্মিত। যাঁহারা এই তাহ্‌রিকে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি আমি শ্রদ্ধাবনত। আমার বিশ্বাস, কোন প্রকার কায়েমী স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার ভয় যাঁহাদের নাই, এমন যে কোন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের দৃষ্টিতেই এই ব্যাপক গোমরাহীর প্লাবনে তবলীগী জামাতের প্রচেষ্টা একটি অব্যর্থ ও নিখুঁত কর্মপ্রচেষ্টা হিসাবে অবশ্যই প্রতিভাত হইবে। নিছক ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি বা অজ্ঞতার কারণে যাঁহারা হযরত মাওলানা ইলয়াসের কর্ম-প্রচেষ্টার যথার্থ মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আমার করুণা জাগে। কেননা, মূর্খতা প্রসূত বিদ্বেষ বা স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত বুদ্ধি-বিকৃতির কোন সহজ চিকিৎসা আছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে তাঁহাদের প্রতিও আমার বিনীত আরজ, মূর্খতার আড়ালে থাকিয়া মধ্যাহ্ন গগনের সূর্যকে দিপ্তিহীন বলিয়া প্রমাণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে লিপ্ত না হইয়া খোলা মনে জানবার এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। নেক নিয়ত থাকিলে আল্লাহ্‌ পাক অন্তর অবশ্যই প্রশস্ত করিয়া দিবেন, সত্য উপলব্ধি করার তওফীক লাভ করা সম্ভব হইবে।

পরিশেষে আমার ন্যায় 'ছিয়াহ্‌কারকে দিয়া আল্লাহ্‌ তাঁরই একপ্রিয় বান্দার জীবনকথা বাংলা ভাষাভাষি মানুষের কাছে তুলিয়া ধরিবার যে তওফীক দিয়াছেন, সেই কথা স্মরণ করিয়া বারবার শুকরিয়ার সেজদা জানাই। মাওলা! তোমার দেওয়া কর্মশক্তি তোমার পছন্দনীয় পথে যেন সর্বদা ব্যয় হয়, এই তওফীক হইতে কখনও বঞ্চিত করিও না!! আমীন!! ছুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

মুহিউদ্দীন খান

মাসিক মদীনা কার্যালয়, ঢাকা।

এই হিমালয়ান উপমহাদেশে ইসলামী শক্তির অভ্যুদয়ের ইতিহাস যেমন চমকপ্রদ, তেমনি স্বাধীনতা ও শাসন-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তি এবং তাহাদের এতদ্দেশীয় দোসর শিখ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিরামহীন আগ্রাসনের মোকাবেলা করিয়া মুসলমান জাতির পক্ষে এই দেশের মাটিতে অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার সীমাহীন সংগ্রাম-সাধনাও রীতিমত লোমহর্ষক।

ইংরেজরা মুসলমানদের নিকট হইতে রাজত্ব ছিনাইয়া নিয়াই তুষ্ট ছিল না। বিপন্ন মুসলিম জাতির দ্বীন-ঈমান এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অনুভূতিহীন একটি পঙ্গু জনসমাজে পরিণত করিবার জন্যও চারিদিক হইতে ব্যাপক ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিয়াছিল।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের এইদেশীয় সহযোগীদের অন্যতম প্রধান অংশ নব-উত্থিত শিখ শক্তির ব্যাপক আক্রমণ এবং আর্যসমাজীদের অত্যাচার-নির্যাতন ও গণহত্যার বিভীষিকার মধ্যে এই দেশের বুকে মুসলমান জাতির অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার জেহাদে সুযোগ্য নেতৃত্বদান করিয়াছিলেন ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহর সুযোগ্য সন্তান হযরত শাহ্‌ আব্দুল আজীজ, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ এবং শাহ্‌ সাহেবের সাগরেদ-মুরীদ ও ভাবশিষ্যগণ। ওয়ালিউল্লাহ্‌-খান্দানের সেই সংগ্রামী নেতৃত্বের কথা এই দেশের মুসলিম ইতিহাসে চিরকাল প্রেরণার উৎস হইয়া থাকিবে।

হযরত শাহ্‌ আব্দুল আজীজ চতুর্মুখী আক্রমণের মোকাবেলায় উপমহাদেশীয় মুসলমান সমাজকে ইসলামী জীবনধারায় সুসংগঠিতকরণ, এলমে-দ্বীনের ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে স্বীয় তাহ্‌জীব-তমদ্দুনের সংরক্ষণ এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সুযোগ্য নেতৃত্ব দান করেন। তাঁহার সুযোগ্য সাগরেদ অগ্নিপুরুষ হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ও ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত ইসমাইল শহীদকে সশস্ত্র জেহাদের পথে তিনিই নিয়োজিত করেন।

পরবর্তী যুগে হযরত শাহ্ আব্দুল আজীজের কর্মধারার মধ্যে এমন সব সুযোগ্য লোকের জন্ম হইয়াছিল, যাঁহাদের বিরামহীন কর্ম প্রচেষ্টার ফলে আজ পর্যন্ত উপমহাদেশ তথা সারা এশিয়ায় বিভিন্নমুখী দ্বীনিতাহ্রীক অগ্রসর হইতেছে।

হযরত শাহ্ আব্দুল আজীজের সাগরেদগণের মধ্যে কান্দালার ঐতিহ্যবান সিদ্দিকী পরিবারের মুফতী ইলাহী বখশ্ ছিলেন একজন স্বনামধন্য বুজুর্গ আলেম ও যশস্বী গ্রন্থকার। আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় তাঁহার রচিত চল্লিশটিরও অধিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার খান্দান ছিল এলেম, তাকওয়া এবং দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ সুখ্যাতির অধিকারী। এই বংশে পরবর্তীকালেও অনেক ওলী-বুজুর্গ এবং গ্রন্থকারের জন্ম হয়।

কান্দালার এই খান্দানেরই আর একটি শাখা বাস করিতেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঝানজানা শহরে। এই পরিবারেও অনেক ওলী-বুজুর্গ ও খ্যাতনামা আলেমের জন্ম হয়। তাঁহাদের মধ্যে মাওলানা মোজাফফর হোসাইন সাহেব ছোট-বড় সকলের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মাওলানা ইসমাইল

ঝানজানা পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মাওলানা মুহম্মদ ইসমাইল ছিলেন একজন অনন্য সাধারণ আলেম ও ইবাদত-গোযার আল্লাহ্ ওয়ালা বুজুর্গ ব্যক্তি। তিনি পুরাতন দিল্লীর হযরত নিজামুদ্দিন সুলতানুল আওলিয়ার মাজারের সন্নিকটে 'চৌষঠ খাম্বা' নামক ঐতিহাসিক ইমারতের দ্বারদেশে লোহিত বর্ণের একটি জীর্ণ কামরায় বাস করিতেন। শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের আত্মীয় মির্জা ইলাহী বখশের সন্তানদের গৃহ-শিক্ষক এবং অনতিদূরে অবস্থিত টিনের ছাউনীযুক্ত বাংলাওয়ালী মসজিদের ইমামতির দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। কোরআন-হাদীসের তালীম, ইবাদত-বন্দেগী এবং অবসর সময় পথিক মুসাফিরের খেদমত করিয়া তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত।

শহরের বাহির হইতে যে সমস্ত দরিদ্র লোক মোট বহন করিয়া এই পথে যাতায়াত করিত; মাওলানা ইসমাইল সাহেবের মসজিদের সম্মুখে আসিয়া অনেক সময় তাহারা বিশ্রাম করিত। মাওলানা সাহেব তাহাদের মাথার বোঝা নামাইতে সাহায্য করিতেন, নিজের হাতে কূপ হইতে পানি তুলিয়া তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। লোক সমাগম বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে পথিকগণের সুবিধার্থে অতিরিক্ত ঘটি-বদনার ব্যবস্থা করিতেন। যে কোন উপায়ে মানুষের সেবা করিয়া তিনি দুই রাকাত শুক্রানার নামাজ পড়িতেন এবং মুনাজাত

করিতেন- "আয় আল্লাহ্! তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তোমার বান্দাদের এইটুকু খেদমত করিবার তওফীক দান করিয়াছ, অথচ আমি এর যোগ্য ছিলাম না!" এ ছাড়াও মাওলানা সাহেব সব সময় জিকির-আজকার নফল ইবাদত-বন্দেগী ও কোরআন তেলাওয়াতে নিমগ্ন থাকিতেন।

একবার তিনি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহীর নিকট মুরীদ হইয়া তরীকতের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে হযরত গঙ্গোহী তাঁহাকে জবাব দিয়াছিলেন- "তরীকতের পথে জিকির-আজকার করিয়া মানুষ যা হাসিল করিতে চায়, আপনার মধ্যে তা পরিপূর্ণরূপে বর্তমান রহিয়াছে। সুতরাং আপনার পক্ষে মুরীদ হওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তাই দেখিতেছি না। কেননা, কোন লোক যদি উত্তমরূপে কোরআন পাঠ আয়ত্ত করিবার পর মনে করে যে, সে কায়দায়ে-বাগদাদী পড়ে নাই, তা তাহার পক্ষে পাঠ করা উচিত; তখন সেই কাজ যেমন অর্থহীন হইবে, তেমনি রূহানী জগতে আপনি যে মাকামে অবস্থান করিতেছেন, সেখান হইতে নতুন করিয়া মুরীদ হওয়ার কথা বলাও অর্থহীন।"

কোরআন তেলাওয়াত ছিল মাওলানা মুঃ ইসমাইল সাহেবের সার্বক্ষণিক নেশার বস্তু। অনেক সময় আকাঙ্ক্ষা করিতেন- সুদূর বনে-জঙ্গলে যাইয়া যদি ছাগল চরানোর কাজ এবং তৎসঙ্গে সর্বক্ষণ কোরআন তেলাওয়াতে মগ্ন থাকার সুযোগ পাইতাম, তবে কতই না ভাল হইত!

প্রথম স্ত্রীর ইন্তেকালের পর মাওলানা মুঃ ইসমাইল কান্দালার সিদ্দিকী খান্দানে হযরত শাহ মুঃ ইস্হাকের সাগরেদ এবং শাহ মুঃ ইয়াকুব সাহেবের খলিফা মাওলানা মোজাফফর হোসাইন সাহেবের নাত্নীর সহিত দ্বিতীয়বার বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ফলে কান্দালায় তাঁহাকে নিয়মিত যাতায়াত করিতে হইত। শেষ পর্যন্ত কান্দালাই তাঁহার স্থায়ী আবাসে পরিণত হয়।

মাওলানা মুঃ ইসমাইলের ন্যায় তাঁহার পরিবার-পরিজনের মধ্যে তাকওয়া-পরহেজগারী ও ইবাদত-বন্দেগীর অভ্যাস ছিল অনন্য সাধারণ। নিয়ম ছিল, রাতের বেলায় পর্যায়ক্রমে পরিবারের কোন না কোন সদস্য জাগিয়া থাকিয়া ইবাদত-বন্দেগী বা এলেম চর্চায় মশগুল থাকিবেন। রাত্রির প্রথম দিককার ১২-১টা পর্যন্ত মধ্যম ছেলে মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব পড়াশোনা করিতেন। তাঁহার পড়া শেষ হইলে মাওলানা ইসমাইল জাগিয়া উঠিতেন। শেষ রাত্রের দিকে বড় ছেলে মাওলানা মুহম্মদ সাহেবকে জাগাইয়া দেওয়া হইত। তাকওয়া-পরহেজগারী সুখ্যাতির জন্যই মাওলানা ইসমাইল সাহেব দিল্লীর সকল মহলে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হইতেন। সেই যুগের দিল্লীতে মুসলমানদের মধ্যে এমন

সব দলাদলি ও মাজহাবী কোন্দল ছিল যে, একজন আলেম আর একজনের পেছনে নামাজ পড়িতে সম্মত হইতেন না। তেমনি প্রত্যেকের অনুসারীগণের মধ্যেও ছিল সীমাহীন হানাহানি। সর্বক্ষণ চলিত একদল আর একদলকে ছোট করিবার বিরামহীন প্রয়াস। এই অবস্থার মধ্যেও কোন মত-পথের লোকই মাওলানা মুঃ ইসমাইলের বিরুদ্ধে কখনও কোন অভিযোগ উথাপন করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহার পেছনে নামাজ পড়িতেও কেহ কোনদিন আপত্তি জানায় নাই।

মেওয়াত এলাকার সহিত সম্পর্কের সূত্রপাত

একদিন মাওলানা সাহেব মসজিদে আসিয়া দেখিলেন, জামাতে নামাজ পড়িবার মত কোন লোক নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন, যদি দুই-একজন লোক ডাকিয়া আনিয়া জামাতের ব্যবস্থা করা যায়! তিনি দেখিতে পাইলেন, কয়েকজন দরিদ্র মুসলমান মজদুরীর তালাশে শহরের দিকে যাইতেছে। তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শহরে গেলে রোজ যে পরিমাণ মজদুরী পাওয়া যায় তা পরিশোধ করার শর্তে তাহারা মসজিদে আসিতে রাজী আছে কি না? সঙ্গে সঙ্গে তাহারা রাজী হইয়া গেল। মাওলানা লোকগুলিকে নিয়া মসজিদে আসিলেন এবং নামাজ-কলেমা ইত্যাদি শিক্ষা দিতে শুরু করিলেন। এমনিভাবে রোজকার মজদুরী পরিশোধ করিয়া তিনি কয়েকজন লোককে পাক্কা নামাজী করিয়া তুলিলেন। কালে এইভাবে বাংলাওয়ালী মস্‌জিদের মাদ্রাসার সূত্রপাত হইল। এরপর হইতে সব সময় মেওয়াত এলাকার দশ-বার জন করিয়া লোক মসজিদে থাকিয়া কোরআন ও মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করিতেন। মির্জা-ইলাহী বখশ্ ইহাদের খানার ব্যবস্থা করিতেন। কিছু সংখ্যক গরীব মুসলমানকে রোজকার মজদুরী প্রদান করিয়া মাওলানা ইসমাইল সাহেব দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার যে অনন্য নজীর স্থাপন করিয়া গেলেন, উহাই শেষ পর্যন্ত রাজপুতনা সন্নিহিত সুদূর গ্রামাঞ্চলের অনুন্নত মুসলমান সমাজের মধ্যে দ্বীনি এলেম শিক্ষা করিবার ব্যাপক ভবিষ্যতের দ্বারোদঘাটন করে।

মাওলানা সাহেবের ইন্তেকাল

১৩১৫ হিজরীর ৪ঠা শাওয়াল মোতাবেক ১৮৯৮ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী মাওলানা মুহম্মদ ইসমাইল দিল্লীর খেজুরওয়ালী মসজিদে ইন্তেকাল করেন। তাঁহার জানাযায় এত লোক সমাগম হইয়াছিল যে, মসজিদ হইতে নিজামুদ্দীন পর্যন্ত সাড়ে তিন মাইল পথে কোথাও তিল ধারণের স্থান ছিল না। খাটিয়ার হাতলের সঙ্গে লম্বা কাঠ সংযোজন করিয়া দেওয়ার পরও এই সুদীর্ঘ পথে

অনেকের পক্ষেই খাটিয়ায় কাঁধ লাগানোর সুযোগ হইয়া উঠে নাই। দিল্লী শহরের সর্ব মত-পথের লোকজন তখনকার দিনে আর কোন মওকায় এমন প্রাণঢালা শ্রদ্ধা নিয়া একত্রিত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। অত্যধিক ভীড়ের দরুন বারবার জানাযা পড়িতে হয়। এমনকি দাফন করিতেও কিছুটা বিলম্ব হইয়া যায়।

রেওয়ায়েত আছে, সেই যুগের একজন বিশিষ্ট আহলে-কাশফ্ বুজুর্গ ব্যক্তি কাশফের মাধ্যমে দেখিতে পাইলেন, মাওলানা ইসমাইল সাহেব বলিতেছেন–"আমাকে শীঘ্র বিদায় দাও। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে-কেরামের এক জামাতসহ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এই দেরীর জন্য আমি লজ্জিত হইতেছি।"

মধ্যম সাহেবজাদা মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহইয়া জানাযার নামাজ পড়ান। বিভিন্ন আকীদা ও মত-পথের লোক বিনা দ্বিধায় এই জানাযার জামাত আদায় করেন।

সন্তানাদি

মাওলানা মুহম্মদ ইসমাইল সাহেব মৃত্যুকালে তিন সন্তান রাখিয়া যান। প্রথম বিবির পক্ষে মাওলানা মুহম্মদ সাহেব ছিলেন ইঁহাদের মধ্যে সকলের বড়। পরে তিনিই পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।

দ্বিতীয় বিবি হযরত মাওলানা মোজাফফর হোসাইন সাহেবের নাতনীর গর্ভে আরও দুই ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের একজন মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহইয়া এবং সর্ব কনিষ্ঠজন মাওলান মুহম্মদ ইলয়াস (রাহঃ)।

১৩০৩ হিজরী সনে মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াসের জন্ম হয়। জন্ম তারিখের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নাম রাখা হয় আখতার ইলয়াস।

বাল্যকাল

মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রাহঃ)-এর বাল্যকাল অতিবাহিত হয় মাতুলালয় কান্দালা এবং নিজামুদ্দীনে পিতার সাহচর্যে।

কান্দালার সেই ঐতিহ্যবাহী খান্দান ছিল তখন দ্বীনদারী, ইবাদত-বন্দেগী এবং এলেম চর্চার ক্ষেত্রে সারা হিন্দুস্থানে নজিরবিহীন। পুরুষদের পাশাপাশি খান্দানের মহিলাগণের মধ্যেও নফল ইবাদত, কোরআন তেলাওয়াত এবং এলেম চর্চা এমন এক পর্যায়ে গিয়া পৌছিয়াছিল–যা আজকের যুগের অনেক বিজ্ঞ আলেম এবং আবেদের পক্ষেও বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হইবে।

রমজান মাসে অন্তপুরেও কোরআন তেলাওয়াতের ব্যাপক এন্তেজাম হইত।

ঘরের ছেলেরা তেলাওয়াতে মশগুল থাকিত, মা-খালা-ভগ্নিগণ তাহা শুনিতেন, নিজেরা কোরআন শরীফ পাঠ করিতেন, রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া নফল নামাজের মধ্যে কোরআন শরীফ খতম করিতেন।

সাধারণতঃ কোরআন শরীফ তরজমাসহ তফসীরে মাজাহেরে হক, মাশারেকুল্-আনওয়ার, হেছনে-হাছীন প্রভৃতি কিতাব ছিল পরিবারের মেয়েদের সাধারণ পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। অন্তপুরের প্রায় প্রত্যেকেই এই সমস্ত কিতাব পাঠে নিরত থাকিতেন।

ইবাদত-বন্দেগী এবং এলেম চর্চার পাশাপাশি পারিবারিক পরিবেশে মেয়েরা যে সমস্ত গল্প-গুজব করিতেন তার মধ্যে থাকিত হযরত শাহ্ আব্দুল আজীজ, হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ প্রমুখ এবং তাঁহাদেরই অনুসারী খান্দানের অন্যান্য বুজুর্গগণের তাকওয়া-পরহেজগারী ও দ্বীনের জন্য অনন্য সাধারণ ত্যাগ-তিতীক্ষার হৃদয়গ্রাহী কাহিনীমালা। শিশুদিগকে তাঁহারা ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কাহিনী না শুনাইয়া শহীদানের বীরত্ব কাহিনী বলিতে বলিতে ঘুম পাড়াইতেন।

পরিণত বয়সে হযরত মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস (রাহঃ) বাল্যকালের সেইসব স্মৃতিকথা শুনাইয়া বলিতেন– "ঐ সমস্ত পবিত্র কোলেই আমরা লালিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, আজকাল মুসলমানদের ঘরানা এইরূপ পূন্যবতী মায়েদের কোল হইতে শূন্য হইয়া গিয়াছে।

এই পরিবারের প্রাচীনাদের জন্য বালাকোটের শহীদানের কাহিনী এবং সারা উপমহাদেশে দাবানলের ন্যায় ছড়াইয়া পড়া জেহাদী আন্দোলনের লোমহর্ষক ঘটনাবলী ছিল অনেকটা নিজেদেরই পারিবারিক ঘটনাবলীর মত। মাওলানা ইলয়াস সাহেবের নানী বিবি আমাতুর রহমান ছিলেন হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের অন্যতম বিশিষ্ট সহচর হযরত মাওলানা মোজাফফর হোসাইন সাহেবের কন্যা। তিনি ছিলেন যুগের রাবেয়া বস্‌রী। সর্বদা প্রায় ইবাদত-বন্দেগীতেই মশগুল থাকিতেন। হযরত মাওলানা ইলয়াস বর্ণনা করেন, "নানীআম্মা নামাজের মধ্যে এমন নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন যে, নামাজে হযরত মাওলান গঙ্গোহীর মধ্যে কেবল আমি এই ধরনের নিমগ্নতা দেখিয়াছি।" উল্লেখ্য যে, হযরত মাওলানা গঙ্গোহীর নামাজ ছিল সমসাময়িক উলামা তবকার মধ্যে একান্তই অনন্যসাধারণ।

বিবি আমাতুর রহমান পিতার যবানী জেহাদের যে সমস্ত কাহিনী শুনিয়াছিলেন, পরিবারের শিশুদের নিয়া সেইসব গল্প বলিতেন। দ্বীনের জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য এইভাবেই সকলকে বাল্যকাল হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেন।

শেষ বয়সে তিনি আল্লাহর ধ্যানে এমনই নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন যে,

খাওয়া-দাওয়ার কথাও তাঁহার খেয়াল থাকিত না। কেহ্ কিছু দিলে খাইতেন, অন্যথায় এমনিতেই বসিয়া আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিতে থাকিতেন।

হযরত মাওলানা ইলয়াসের (রাহঃ) মাতা বিবি সুফিয়াও ছিলেন নজিরবিহীন একজন তাপসী। তিনি কোরআনের হাফেজ ছিলেন। বিবাহের পর প্রথম সন্তান মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেবকে কোলে নিয়া তিনি কোরআন হেফ্জ করেন। তাঁহার ইয়াদ এমন মজবুত ছিল যে, সাধারণ হাফেজগণ তাঁহার সম্মুখে কোরআন শুনাইতে সাহস করিত না।

রমজান মাসে তিনি প্রতিদিন পূর্ণ এক খতম এবং অতিরিক্ত আরও দশপারা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন। এইভাবে ত্রিশ দিনে সাধারণতঃ তাঁহার চল্লিশটি খতম হইয়া যাইত। ঘরের সাধারণ কাজকর্মে নিরত থাকিয়াই তিনি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতে থাকিতেন। রমজান ছাড়া অন্যান্য সময়ে তাঁহার দৈনন্দিন নিয়ম ছিল, দরুদ শরীফ– পাঁচ হাজার বার, আল্লাহু আল্লাহু জিকির-পাঁচ হাজার বার, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-উনিশশত বার, ইয়া মুগ্‌নী-এগারশত বার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-বারশত বার, ইয়া হাইউ ইয়া কাইয়ুম-দুইশত বার, হাছবিয়াল্লাহু ওয়া নেমাল ওয়াকীল-পাঁচশত বার, সোবহানাল্লাহ্-দুইশত বার, আলহামদু লিল্লাহ-দুইশত বার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-দুইশত বার, আল্লাহু আকবার-দুইশত বার, আস্তাগ ফেরুল্লাহ-পাঁচশত বার, উফাবেবেযু আমরী ইলাল্লাহ-একশত বার, সোবহাল্লাহু ওয়ানেমাল ওয়াকীল-একশত বার, রাব্বী ইন্নি মাগলুবুন্ ফান্তাছের- একশত বার, রাব্বী ইন্নি মাছছানি য়ায যুররু ওয়া আন্তা আরহামুর রাহিমীন–একশত বার, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সোবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনায্যালেমীন- একশত বার নিয়মিত পাঠ করিতেন। তার সঙ্গে সঙ্গে কোরআন শরীফের অন্ততঃ এক মঞ্জিল রোজ অবশ্যই তেলাওয়াত করিতেন। (তাজ্কেরাতুল্ খলীল)

প্রাথমিক শিক্ষা

খান্দানের সাধারণ দস্তুর অনুযায়ী হযরত মাওলানা ইলয়াসও খুব অল্প বয়সেই কোরআন শরীফ হেফ্জ করেন। পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে মাতা-মাতামহীর নেগরানীতেই প্রাথমিক কিতাবাদিও পড়িতে শুরু করেন। এই পূন্যবান খান্দানে কোরআন শরীফ হেফ্জ করিবার রীতি এমনই ব্যাপক ছিল যে, পারিবারিক মসজিদে জামাতের সময় প্রায় দেড় কাতারের মধ্যে একমাত্র মোয়াজ্জেম ব্যতীত আর যাঁহারা দাঁড়াইতেন তাঁহাদের মধ্যে কোরআনের হাফেজ ব্যতীত কাহাকেও পাওয়া যাইত না।

শিশুকালে মাতামহী মাওলানা ইলয়াসকে অসাধারণ স্নেহ করিতেন। অনেক সময় পিঠে হাত রাখিয়া বলিতেন– আখতার! জানিনা কেন তোর শরীর হইতে আমি সাহাবায়ে-কেরামের সুগন্ধ পাই। কখনও কখনও বলিতেন– তোর সঙ্গে আমি সাবাহীগণের ছায়া চলাফেরা করিতে দেখি।

বাল্যকাল হইতেই মাওলানা ইলয়াস-এর মধ্যে এমন সব গুণের প্রকাশ ঘটিয়াছিল– যার নমুনা একমাত্র সাহাবায়ে-কেরামের চরিত্রেই দেখা যায়। দ্বীনের জন্য মহব্বত, দ্বীন প্রচারের ব্যাপারে অধীর আগ্রহ এবং চিন্তা তাঁহাকে ছাত্রজীবনেই সাহাবায়ে-কেরামের শানে নিয়া উপনীত করিয়াছিল। তাঁহার ওস্তাদ শায়খুল্ হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব বলিতেন– "মৌলবী ইলয়াসকে দেখিলে আমার সাহাবায়ে-কেরামের কথা স্মরণ হইয়া যায়।"

আল্লাহর দ্বীনের প্রতি সীমাহীন মহব্বতের যে উত্তাপ তাঁহার মধ্যে জন্মগতভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল, উত্তরকালে একটি নিয়মিত আন্দোলনের ধারায় যাহা সারা জাহানকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে, বাল্যকালেই তার কিছু কিছু আভাস তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইত। পারিবারিক পরিবেশে দ্বীনের জন্য কুরবানীর বিভিন্ন কাহিনী শ্রবণ করিয়া সেই উত্তাপ অনেক সময় স্ফুলিঙ্গের আকারে আত্ম-প্রকাশও করিত। কান্দালার মৌঃ রিয়াজুল ইসলাম নামক তাঁহার এক বাল্যসাথী ও মক্তবের সহপাঠী বর্ণনা করিয়াছেন– একদিন বালক ইলয়াস একটি লাকড়ী কাঁধে করিয়া মক্তবে আসিলেন এবং আমাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন– "ভাই রিয়াজ! চল বে-নামাজীদের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করি।" বলাবাহুল্য, এই ধরনের অনুভূতি সাধারণ বালকদের মধ্যে প্রকাশ পাওয়ার কথা নয়।

হযরত গঙ্গোহীর সান্নিধ্যে

হিজরী তেরশত এগার সনে মাওলানার মধ্যম ভাই মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহইয়া জামানার শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ–ওলীকুলশিরোমণি হযরত মাওলান রশিদ আহমদ গঙ্গোহীর খেদমতে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে গঙ্গোহ চলিয়া গেলেন।

মাওলানা ইলয়াস তখন কখনও পিতার সঙ্গে দিল্লীর নিজামুদ্দীনে আবার কখনও মাতুলালয় কান্দালায় অবস্থান করিতেন। নিজামুদ্দীনে তাঁহার পিতা ইবাদত-বন্দেগীতে এত বেশি মগ্ন থাকিতেন যে, বালক ইলয়াসের লেখা-পড়ার দিকে বেশি নজর দেওয়ার সুযোগ পাইতেন না। ফলে লেখা-পড়া আশানুরূপ হইতেছিল না। মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব এই অবস্থা দেখিয়া পিতার অনুমতি গ্রহণ করতঃ মাওলানা ইলয়াসকে গঙ্গোহে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়া আসিলেন। এখানে বড় ভাইয়ের নিকটেই নতুন করিয়া তাঁহার লেখা-পড়া শুরু হইল। ইহা

হিজরী ১৩১৫ সনের কথা।

গঙ্গোহ ছিল তখন সমগ্র উপমহাদেশের বিশিষ্ট ওলী-আবেদ এবং প্রখ্যাত আলেম-উলামাগণের মিলনকেন্দ্র। জামানার কুতুব হযরত গঙ্গোহীর সান্নিধ্য লাভ করিবার জন্য সারা উপমহাদেশ এমন কি বহির্দেশ হইতেও জ্ঞানী-গুণীগণ ছুটিয়া আসিতেন। এই মহামিলন কেন্দ্রে সকাল-সন্ধ্যা যে সমস্ত মজলিস বসিত, তার মধ্যে সারা মুসলিম জাহানের সমস্যাদিও আলোচিত হইত। অধঃপতিত মুসলিম জাতিকে পতনের গভীর পংক হইতে উদ্ধার করিয়া কোন্ পথে নতুন জীবনের আবেহায়াতে স্নাত করানো যায়, সেই সব বিষয়ই ছিল সকল আলোচনার মূলকথা।

মাওলানা ইলয়াস বাল্যকালেই সেই মহান তীর্থে আসিয়াছিলেন এবং একজন মানুষের পক্ষে জীবনের আদর্শ হিসাবে কোন কিছু পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার সর্বোত্তম যে সময়টুকু, তার সবটুকুই তিনি ব্যয় করিয়াছেন গঙ্গোহে হযরত গঙ্গোহীর সান্নিধ্যে। দশ-এগার বৎসর বয়সে তিনি এখানে আগমন করেন এবং ১৩২৩ হিজরীতে হযরত গঙ্গোহীর যখন ইন্তেকাল হয় তখন মাওলানা ইলয়াস বিশ বৎসরের যুবক। জীবনের এই অতি মূল্যবান সময়টুকু তিনি একাধারে শিক্ষায় গভীর মনোনিবেশ এবং অন্যদিকে হযরত গঙ্গোহীর সান্নিধ্য হইতে এলেম ও মারেফাতের ফয়েজ পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করেন।

জাতির জন্য তাঁহার অন্তরে যে সীমাহীন মহব্বত, পতিত মুসলিম সমাজকে পতনের অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিবার যে অসামান্য আকুতি এবং শয়নে-জাগরণে পথহারা মুসলিম জাতির জন্য শোনিতাশ্রুবর্ষণ করিবার যে উদ্বেগ উত্তরকালে তাঁহাকে দীওয়ানা করিয়া তুলিয়াছিল, তার সবটুকুই তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন দশ বছর হযরত গঙ্গোহীর অতি নিকট সান্নিধ্যের মধ্য হইতে।

মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহইয়া ছিলেন একজন দক্ষ ওস্তাদ এবং স্নেহপ্রবণ মুরুব্বী। লেখা-পড়ায় পরিপূর্ণতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস যাহাতে হযরত গঙ্গোহীর দরবারের পরিপূর্ণ ফয়েজ গ্রহণ করিতে পারেন সেই দিকেও তাঁহার পরিপূর্ণ খেয়াল থাকিত। গঙ্গোহ দরবারে যখনই কোন যোগ্য আলেমের আগমন হইত তখন নিয়মিত ছবক বন্ধ করিয়া মাওলানাকে তাঁহাদের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইত। মাওলানা সাহেব ঐসমস্ত বুজুর্গানের খেদমতে লাগিয়া যাইতেন, কথাবার্তা শুনিতেন, শিক্ষাগ্রহণ করিতেন।

বায়আত

হযরত মাওলানা গঙ্গোহী সাধারণতঃ অল্প বয়স্ক কোন লোক এবং ছাত্রগণকে মুরীদ করিতেন না। লেখা-পড়া শেষ করিবার পরই কেবল মুরীদ হওয়ার অনুমতি প্রদান করিতেন। কিন্তু মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াসের অসাধারণ আগ্রহ এবং রূহানী অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বায়আত হওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

জন্মগতভাবেই মাওলানা ইলয়াসের মধ্যে এমন অসাধারণ যোগ্যতা এবং এশক-মহব্বতের অনুভূতি ছিল–যা মুরীদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ফুটিয়া বাহির হইতে শুরু করিল। শায়খের প্রতি তাঁর এমন আকর্ষণ ছিল যে, কিছুক্ষণ না দেখিয়া তিনি যেন অস্থির হইয়া উঠিতেন। হযরত গঙ্গোহীর সাধারণতঃ হুজরায় নিরিবিলি পরিবেশে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকিতেন। মাওলানা ইলয়াস সেই হুজরায় বসিয়াই অনেক সময় পড়াশোনা করিতেন। হযরত গঙ্গোহী এই বলিয়া তাঁহাকে অনুমতি দিয়াছিলেন যে– "ইলয়াসের উপস্থিতিতে আমার নীরব সাধনায় কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নাই।"

একবার মাওলানা ইলয়াস শায়খের নিকট বর্ণনা করিলেন যে, জিকির করিবার সময় তাঁহার অন্তরে বোঝার মত কি যেন অনুভূত হয়। এই কথা শুনিয়া হযরত গঙ্গোহী একটু চমকিত হইলেন; বলিলেন, এই একই কথা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী তাঁহার শায়খ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কীর (রাহঃ) নিকট বর্ণনা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন–এর দ্বারা অনুমিত হয় যে, আল্লাহ পাক তোমার দ্বারা কোন বিরাট কাজ আঞ্জাম দেওয়াইবেন।

শিক্ষার ব্যাপারেও মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব এমন একটি নতুন পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন– যা দ্বারা গতানুগতিক কিতাব পাঠের চাইতে আরবী ভাষাজ্ঞান এবং স্বাধীনভাবে যে কোন কিতাব পড়িয়া তা পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করিবার যোগ্যতা অতি সাধারণভাবে সৃষ্টি হইয়া যায়। যে পর্যন্ত পাঠ্য কোন কিতাব সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অন্যকে বুঝাইয়া দেওয়ার পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জিত না হইত, সেই পর্যন্ত তাঁহাকে পরবর্তী কোন কিতাব পড়িতে দেওয়া হইত না। এই পন্থায় যোগ্য ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে মেহনত করিয়া হযরত মাওলানা ইলয়াস অতি সহজে সমস্ত পাঠ্য কিতাবে অসাধারণ যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন। এমনকি পাঠ্যাবস্থায় যে সমস্ত কিতাব তিনি পাঠ করেন নাই, শিক্ষকতার সময় কোনরূপ পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সেই সমস্ত কিতাবও অবলীলাক্রমে পড়াইতে পারিতেন।

অসুস্থতা ঃ শিক্ষা জীবনে বিঘ্ন

শারীরিক দিক হইতে হযরত মাওলানা ইলয়াস (রাহঃ) বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। গঙ্গোহে অবস্থানের সময়েই তিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার মাথায় এমন এক ধরনের অসুস্থতা দেখা দিল যে, দীর্ঘ কয়েক মাস মাথা ঝুঁকাইয়া সেজদা দেওয়াও সম্ভবপর হইত না। এই জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ সাত বৎসর তাঁহাকে একফোটা পানিও পান করিতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল, শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি প্রকৃতিগতভাবে এমন সংযমী ছিলেন যে, পানি পান না করিবার কষ্ট তিনি অবলীলাক্রমে বরদাশ্‌ত করিয়া যান। পরবর্তী জীবনেও তিনি কেবল খাওয়ার সময় নামমাত্র পানি ব্যবহার করিতেন।

মাথায় অস্বাভাবিক ব্যথার কারণে চিকিৎসকগণ তাঁহার পড়াশোনা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিলেন। কিছু দিন পর কিছুটা আরোগ্য লাভ করিয়াই তিনি পড়ার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। বড় ভাই মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব অসুস্থ দুর্বল শরীর নিয়া লেখা-পড়া পুনরারম্ভ করিতে বারণ করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাওলানার অস্বাভাবিক উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া তিনিও অনুমতি না দিয়া পারিলেন না। দুর্বল শরীর লইয়াই মাওলানা তাঁহার অসমাপ্ত শিক্ষাজীবন পূর্ণ করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

হযরত গঙ্গোহীর ইন্তেকাল

হিজরী ১৩২৩ সনে কুতবে-আলম হযরত মাওলান রশীদ আহমদ গঙ্গোহী ইন্তেকাল করেন। মাওলানা ইলয়াস প্রিয় মুরশিদের বিদায় মুহূর্তে পাশে বসিয়া সূরা ইয়াছীন পাঠ করিতেছিলেন। শায়খের প্রতি তাঁহার যে অস্বাভাবিক মহব্বত ছিল তা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রিয় মুরশিদের এই বিদায় ব্যথায় তিনি এমন আঘাত পাইলেন যে, দীর্ঘদিন তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইত না। পরবর্তী জীবনে অনেক সময় তিনি বলিতেন, "জীবনে দুইটি আঘাতই আমাকে মূক করিয়া দিয়াছে, প্রথম আমার আব্বার ইন্তেকাল এবং দ্বিতীয়বার আমার শায়খ হযরত গঙ্গোহীর চির বিদায়। ভাই! জীবনের সব কান্না যেন আমি হযরত গঙ্গোহীর ওফাতের সময়ই কাঁদিয়া ফেলিয়াছি।"

এলমে-হাদীসের সনদ

লেখা-পড়া শেষ করিয়া হযরত মাওলানা এলমে-হাদীসের সনদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে দারুল উলুম দেওবন্দে হযরত শায়খুল-হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল

হাসানের খেদমতে হাজির হইলেন। এক বৎসরকাল এখানে হযরত শায়খুল-হিন্দের নিকট বোখারী শরীফ ও তিরমিজী শরীফ পাঠ করিয়া সনদ লাভ করেন। এখানে প্রখ্যাত মোহাদ্দেস হযরত আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াবী ছিলেন তাঁহার সহপাঠী।

হাদীসে সনদ লাভ করিবার পর হযরত শাহ্ আব্দুল আজীজ-প্রবর্তিত জেহাদী আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করিবার অঙ্গীকারসহ্ হযরত শায়খুল-হিন্দের হাতে জেহাদের বায়আত গ্রহণ করেন।

দেওবন্দ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেবের নিকট হাদীস শরীফ পাঠ করেন।

এলমে-দ্বীনে পরিপূর্ণতার সনদ লাভ করার পর তিনি হযরত শায়খুল-হিন্দের হাতে দ্বিতীয়বার মুরীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় হযরত শায়খুল-হিন্দ তাঁহাকে হযরত গঙ্গোহীর বিশিষ্ট খলিফা হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীর খেদমতে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। ওস্তাদের পরামর্শকে শিরোধার্য করিয়াই তিনি হযরত সাহারানপুরীর খেদমতে হাজির হইয়া ছুলুকের রাস্তায় কামালাত অর্জন করেন।

ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্নতা

গঙ্গোহে অবস্থানকালে হযরত গঙ্গোহীর ইন্তেকালের পর কিছুকালের জন্য মাওলানা সম্পূর্ণ নিরিবিলি জীবন বাছিয়া নেন। এমনকি দিনের পর দিন তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও তখন বাহির হইত না। অধিকাংশ সময় ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকিতেন। মাঝে মাঝে গভীর ধ্যানে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেন। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহম্মদ যাকারিয়া বর্ণনা করেন, সেই যুগে আমরা গঙ্গোহে প্রাথমিক কিতাবাদি পড়িতাম। হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব আমাদিগকে ফারসী পহেলী পড়াইতেন। তিনি তখন অধিকাংশ সময় হযরত মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস গঙ্গোহীর মাজার পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। আমরা পড়া তৈরী করিয়া সেখানেই তাঁহার নিকট হাজির হইতাম। কিতাব খুলিয়া ছবকের স্থানে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া আমরা পড়িতে শুরু করিতাম। যেখানে আমরা ঠেকিয়া যাইতাম তিনি হাতের ইশারায় সেখানেই ছবক বন্ধ করিয়া দিতেন। আমরা বুঝিতাম, পড়া আর আগে অগ্রসর হইবে না, নতুন করিয়া পড়া তৈরী করিয়া আসিতে হইবে।

তখনকার সময়ে মাওলানা নফল নামাজের মধ্যেই অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতেন। মাগরিবের পর হইতে এশার সময় পর্যন্ত প্রায় নফল নামাজেই

কাটাইয়া দিতেন। আল্লাহ্র ধ্যানে গভীর নিমগ্নতার এই সময়টিতে তাঁহার বয়স হইয়াছিল পঁচিশ কি ছাব্বিশ বৎসর মাত্র।

কর্তব্যে গভীর একাগ্রতা এবং স্বনিষ্ঠ আগ্রহ্ ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই একাগ্রত ও নিষ্ঠার বলেই শারীরিক দিক দিয়া নিতান্ত দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি এমন বিরাট কাজ আঞ্জাম দিয়া গিয়াছেন। কর্তব্যের ডাক আসিলে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন। শরীরের প্রতি লক্ষ্য থাকিত না। মজযুবের ব্যগ্রতা সহকারে অভীষ্টের পানে ছুটিয়া চলিতেন। তাঁহার জীবনে মজযুবিয়তের এমন অনেক ঘটনা দেখা যায়; সাধারণ বুদ্ধিতে যার পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

একবারকার ঘটনা– শুনিতে পাইলেন, মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রাহঃ) দিল্লীতে তশরিফ আনিয়াছেন। তখন তিনি কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। শরীর এত দুর্বল যে, উপরের কামরা হইতে নীচে আসারও শক্তি নাই। কিন্তু প্রিয় মুরশিদের আগমনবার্তা শুনার সঙ্গে সঙ্গেই বিছানা হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং পায়ে হাঁটিয়া বাড়ী হইতে দিল্লীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। দিল্লী পৌঁছার আগ পর্যন্ত কখনও তাঁহার খেয়াল হয় নাই যে, তিনি মারাত্মক অসুস্থ, শারীরিক দিক দিয়া চলাফেরা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

সমসাময়িক ওলামা ও আওলিয়াগণের সহিত সম্পর্ক

জীবনের এই পর্যায়ে হযরত গঙ্গোহীর খলিফাবৃন্দ এবং সমসাময়িক অন্যান্য ওলামা ও আওলিয়াগণের সঙ্গে তাঁহার ভক্তি ও মহব্বতের সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। হযরত শাহ্ আব্দুর রহীম রায়পুরী, শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী প্রমুখ বুজুর্গানে-দ্বীনের সঙ্গে এমন মহব্বতের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, অনেক সময় বলিতেন, এই সমস্ত বুজুর্গানকে আমি আমার অস্তিত্বের অঙ্গ হিসাবে মনে করি। অন্যদিকে সমসাময়িক ওলামা ও বুজুর্গানে-দ্বীনের সকলেই তাঁহার প্রতি সীমাহীন আস্থাশীল ছিলেন। ইবাদত-মোশাক্কাত এবং এলেম ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে তাঁহাকে অতি উচ্চে স্থান দিতেন। সকল মহলেই তাঁহার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি আসন যেন সকলের অলক্ষ্যেই নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। যুগশ্রেষ্ঠ ওলামা ও আওলিয়াগণের মাহ্ফিলে সকলে ইমামতির জন্য তাঁহাকেই আগে বাড়াইয়া দিতেন।

একবারকার ঘটনা– কান্দালায় হযরত শাহ্ আব্দুর রহীম রায়পুরী, হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ ওলামা-বুজুর্গগণ একত্রিত হন। নামাজের সময় সকলে মিলিয়া

হযরত মাওলানা ইলয়াসকে ইমামতির জন্য হুকুম করিলেন। ব্যাপার দেখিয়া বয়োবৃদ্ধ মৌলবী বদরুল হাসান সাহেব একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন, এত বড় বড় গাড়ী, আর ইঞ্জিন এমন হাল্‌কা পাত্‌লা! বুজুর্গগণের মধ্য হইতে একজন জবাব দিলেন–ইঞ্জিনের বৈশিষ্ট্য অবয়ব নয়, তার ভেতরকার শক্তি।

পরিবারের মধ্যে বাল্যকাল হইতেই সকলে তাঁহাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখিতেন। অল্প বয়সেও বয়োবৃদ্ধগণ পর্যন্ত তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। মাওলানা মুহম্মদ ইয়াহইয়া সাহেব ছিলেন বড় ভাই, পিতার অবর্তমানে একমাত্র অভিভাবক মুরুব্বী। কিন্তু তিনিও তাঁহার এই রোগা-পাতলা ভাইটিকে অত্যন্ত মর্যাদার আসন দান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল হুবহু হযরত ওসমানের (রাঃ) সঙ্গে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্কের ন্যায়।

শারীরিক দুর্বলতার জন্য বাল্যকাল হইতে তিনি কখনও কোন পরিশ্রমের কাজে অংশগ্রহণ করিতে পারিতেন না। লেখা-পড়া এবং ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যেই তাঁর সময় অতিবাহিত হইত। অপরদিকে বড় ভাই মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। জীবিকার জন্য তিনি কিতাবের ব্যবসা করিতেন। সারাদিন কুতুবখানার কাজেই লাগিয়া থাকিতেন। এই দোকানটিই ছিল পরিবারের সকলের একমাত্র আয়ের উৎস। কিন্তু বড় ভাই একাই দোকানের সমস্ত কাজকর্ম আঞ্জাম দিতেন। ছোটভাইকে কখনও কাজ করিতে দিতেন না। কুতুবখানার প্রধান কর্মচারী ছিলেন মাওলানা ইয়াহইয়ার অত্যন্ত অনুগত এবং বিশ্বস্ত লোক। একদিন তিনি কথায় কথায় বলিয়া ফেলিলেন, আপনি একাই এত মেহনত করেন, অথচ পরিবারের সকলেই দোকান হইতে খরচ-পত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। মৌলবী ইলয়াস তো পড়াশোনার ফাঁকে একবেলা আসিয়া দোকানে বসিতে পারেন!

মাওলান ইয়াহইয়া এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কর্মচারীকে বলিলেন, হাদীস শরীফে আছে – তোমাদের মধ্যে যাহারা দুর্বল তাহাদের উসিলাতেই আল্লাহ্ পাক তোমাদিগতে রিজিক দান করেন, সাহায্য করেন। আমার ধারণা, এই দুর্বল ছেলেটার উসিলাতেই আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে রিজিক দান করিতেছেন। সাবধান! ইহাকে তোমরা কখনও কোন কথা বলিও না। যাহা করিতে হয় আমাকে বলিও, আমি সব কাজ করিয়া দেব।

কর্মজীবনের শুরু ঃ বিবাহ

হিজরী ১৩২৮ সনের শাওয়াল মাসে সাহারানপুর হইতে একটি বিরাট কাফেলা হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এই কাফেলায় মাদ্রাসা মাজাহেরুল-

উলুমের বেশ কয়েকজন ওস্তাদও শরীক ছিলেন। ফলে মাদ্রাসার কাজ পরিচালনার জন্য সাময়িকভাবে কিছু সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ইহাদের সঙ্গে হযরত মাওলানা ইলয়াসকেও নিয়োগ করিয়া মাধ্যমিক পর্যায়ের কিতাবাদি পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইহাই ছিল হযরত মাওলানার পক্ষে নিয়মিত কর্ম জীবনের শুরু। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি শিক্ষতার কাজে বেশ দক্ষতার পরিচয় দেন। হজ্বের কাফেলা ফিরিয়া আসার পর নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত অন্যান্য শিক্ষক সরিয়া গেলেন, কিন্তু মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ হযরত মাওলানাকে স্থায়ী নিয়োগপত্র দিয়া রাখিয়া দিলেন। শিক্ষাদান কার্যে তাঁহার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠাও ছিল অনুকরণীয়। সাধারণ কিতাবাদি পড়াইতে গিয়াও তিনি অনেক বড় বড় কিতাব ঘাটাঘাটি করিতেন। বিস্তর পড়াশুনা করিয়া আসিয়া পাঠদান করিতেন। শিক্ষকতার কাজে যৌবনের সেই সাধনার কথা পরবর্তীকালে কর্মজীবন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁহার অনেক ছাত্রের মুখে বহুলভাবে উচ্চারিত হইত।

হিজরী ১৩৩০ সনের ৬ই জিলক্বদ মোতাবেক ১৯১২ সনের ১৭ই অক্টোবর তারিখে মাতুল মৌলবী রউফুল-হাসান সাহেবের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ্ হয়। বড় ভাই মাওলানা মুহম্মদ সাহেব বিবাহ্ পড়ান। বিবাহ্ মজলিসে হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী, হযরত শাহ্ আব্দুর রহিম রায়পুরী, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী প্রমুখ সেই যুগের অনেক প্রখ্যাত আলেম-বুজুর্গ শামিল ছিলেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর বহুল প্রচারিত ওয়াজ "ফাওয়ায়েদুস সোহবা" এই বিবাহ্ মজলিস উপলক্ষে কান্দালায় এবং বিবাহের দিনেই দেওয়া হইয়াছিল।

প্রথম হজ্ব

হিজরী ১৩৩৩ সনে হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রাহঃ) এবং শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রাহঃ) একত্রে হজ্বে যাওয়ার জন্য তৈরী হইলেন। এই খবর শুনিয়া হযরত মাওলানাও হজ্বের জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। বলিতেন, এই দুই বুজুর্গ বাহিরে চলিয়া যাওয়ার পর আমার নিকট সারাদেশ অন্ধকার বলিয়া মনে হইতেছে। সেই অন্ধকারে আমার পক্ষে বাস করা কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? কিন্তু তাঁহার পক্ষে হজ্বে যাওয়ার পথে অনেক বাধা ছিল। প্রথম– খরচ-পত্রের এন্তেজাম, দ্বিতীয়– দীর্ঘ সফরে যাওয়ার জন্য পরিবার পরিজনের জন্য সুব্যবস্থা, বিশেষতঃ বৃদ্ধা মাতার নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ; বড় ভাই-এর সম্মতি। দিন যতই যাইতে লাগিল, হযরত মাওলানা

ততই অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়াই বড় বোন (মৌঃ একরামুল হাসানের মাতা) পথ খরচের জন্য তাঁহার সমস্ত অলংকার দিয়া দিলেন। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেও কেহ কেহ আর্থিক সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা মায়ের অনুমতি অতি সহজেই পাওয়া গেল। বড় ভাই মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেবও আনন্দিতচিত্তেই সম্মতি দিয়া দিলেন। এইবার হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরীর অনুমতির জন্য লিখিলেন, খরচ-পত্রের ব্যবস্থা কি করিয়া হইতেছে তারও বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। হযরত সাহারনপুরী (রাহঃ) সকল বিষয় অবগত হইয়া হজ্বের অনুমতি দিলেন। খরচ-পত্রের জন্য বোনের অলংকারাদি বা ঋণগ্রহণ না করিয়া বরং বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। পীরের পরামর্শ অনুযায়ীই সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হইল।

হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রাহঃ) প্রথম জাহাজে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় জাহাজে শাওয়াল মাসে হযরত শায়খুল-হিন্দের সঙ্গে রওয়ানা হইয়া গেলেন এবং ছয়মাস পর রবিউসসানীতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া মাদ্রাসার কাজে যোগদান করেন।

মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেবের ইন্তেকাল

হযরত মাওলানার হজ্ব হইতে ফিরিয়া আসবার এক বৎসর পর ১০ই জিলক্বদ তারিখে বড় ভাই মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব ইন্তেকাল করেন। মাওলানা ইয়াহইয়া ছিলেন একাধারে হযরত মাওলানার পিতৃস্থানীয় মুরুব্বী, শিক্ষক, স্নেহপ্রবণ বড় ভাই এবং পবিবারের একমাত্র অভিভাবক। তাঁর এই আকস্মিক ইন্তেকালে হযরত মাওলানার অন্তরে যে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই আঘাতের ব্যথা অনুভূত হইত। ভাইয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কেমন যেন হইয়া যাইতেন। ভাইয়ের গুণ-গরিমা বর্ণনা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব এমন এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর হঠাৎ তিরোধান শুধু পরিবারের লোকদের জন্যই নয়, বরং বন্ধু-বান্ধব পরিচিত জন সকলের জন্যই ছিল উহা অত্যন্ত শোকাবহ ঘটনা। বহুকাল ধরিয়া এই শোকের দীর্ঘশ্বাসে বন্ধুমহলে উচ্চারিত হইতে শুনা গিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বস্তি নিজামুদ্দিনের পথে

মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেবের ইন্তেকালের দুই বৎসর পর হিজরী ১৩৩৬ সনের ২৫শে রবিউস্সানী তারিখে সবার বড় ভাই মাওলানা মুহম্মদ সাহেব ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা মুহম্মদ সাহেব ছিলেন একজন ফেরেশ্তাতুল্য চরিত্রের লোক। ইবাদত-বন্দেগী এবং তাকওয়া-পরহেজগারীর সঙ্গে সঙ্গে স্নেহ-মমতা, ধৈর্য ও নম্রতায় তিনি ছিলেন অনন্য। কোরআনের ভাষায়– "আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এই পৃথিবীর বুকে বিনয়-নম্রভাবে চলাফেরা করে," এই কথার সাক্ষাত প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। আল্লাহর উপর সম্পূর্ণরূপে তাওয়াক্কুল করিয়া মরহুম পিতার জায়গায় বস্তি নিজামুদ্দিনের বাংলাওয়ালী মসজিদের ইমামতি এবং মাদ্রাসার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিতেন। তাঁহার জীবন ছিল সংসারত্যাগী দরবেশের জীবন।

মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। দিল্লী এবং মেওয়াত এলাকার কিছুসংখ্যক দরিদ্র ছেলে ইহাতে পড়াশোনা করিত। অত্র এলাকার কিছুসংখ্যক লোক তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তিপোষণ করিতেন। তাঁহাদেরই সাহায্য-সহযোগিতায় মাদ্রাসার ব্যয়ভার নির্বাহ হইত।

মাওলানা মুহম্মদ সাহেবের শেকেল-ছুরত হইতেই তাকওয়া-পরহেজগারী এবং মারেফাতের নূর ফুটিয়া বাহির হইত। মাঝে মাঝে তিনি লোকজনকে উপদেশ দেওয়ার জন্য ওয়াজ করিতেন। সাধারণ বক্তাগণের ন্যায় তিনি লম্বা বক্তৃতা দিতেন না। বসিয়া বসিয়া ছবক পড়ানোর মত করিয়া কোরআন-হাদীসের কথা সহজ-সরল ভাষায় বলিয়া যাইতেন।

তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও ধৈর্যগুণ ছিল সকলের পক্ষে অনুকরণীয়। একবার চোখের এককোণে একটি ফুড়া হইয়া পাকিয়া গেল। ডাক্তার উহাতে অস্ত্রোপচার করিবার জন্য তাঁহাকে ক্লোরোফরম দিয়া জ্ঞানহারা করিয়া নিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি ক্লোরোফরম গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানাইয়া সটান অপারেশন টেবিলের উপর শুইয়া পড়িলেন। এই অবস্থাতেই ডাক্তার নির্বিঘ্নে তাঁহার অপারেশন সমাপ্ত করিলেন। বিস্ময়াভিভূত ডাক্তার সাহেব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, জীবনে তিনি এমন ধৈর্যশীল লোক কখনও দেখেন নাই; এমন লোকের কথা কোথাও শুনেন নাই।

মাওলানা সাহেব ছিলেন হযরত গঙ্গোহীর (রাহঃ) সাগরেদ। হাদীস শরীফ তাঁহার নিকটই পড়িয়াছিলেন। সব সময় ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকিতেন। ইন্তেকালের পূর্বে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোন একদিনও তাঁহার তাহাজ্জুদ ক্বাযা হয় নাই বলিয়া শুনা যায়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জামাতের সহিত নামাজ পড়িয়া গিয়াছেন। ইন্তেকালের দিন জামাতের সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করিবার পর বেতেরের শেষ সেজদায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

হযরত মাওলানা ইলয়াস (রাহঃ) বড় ভাই-এর অসুস্থতার সংবাদে দিল্লী চলিয়া আসিয়াছিলেন। চিকিৎসার সুবিধার্থে বড় ভাইকে নিয়া তিনি কাস্সাবপুরস্থ নবাবওয়ালী মসজিদে অবস্থান করিতেছিলেন। এই মসজিদেই মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেবের ইন্তেকাল হয়। জানাযা নিজামুদ্দিনে আনিয়া কবর দেওয়া হয়।

দাফন-কাফনের পর খান্দানের ভক্ত-অনুরক্তগণ পরামর্শ করিয়া হযরত মাওলানাকে পিতা এবং বড় ভাই-এর আবাদ করা এই মসজিদ ও মাদ্রাসার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। মাদ্রাসার কাজ চালাইবার জন্য অনেকেই মাসিক ভিত্তিতে কিছু কিছু নিয়মিত সাহায্য করারও প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সকলের পীড়াপিড়িতে হযরত মাওলানা হযরত সাহারানপুরীর অনুমতি সাপেক্ষে নিজামুদ্দিনে আসিয়া স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন। মাদ্রাসা ও মসজিদের জন্য সাময়িক এন্তেজাম করিয়া সাহারানপুর ফিরিয়া আসিলেন এবং মুরশিদ হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরীর নিকট সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলেন। হযরত সাহারানপুরী অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া প্রথমে এক বৎসরের জন্য মাদ্রাসা হইতে ছুটি নিয়া নিজামুদ্দিন যাওয়ার অনুমতি প্রদান করিলেন। সাহারানপুর মাজাহেরুল উলুম মাদ্রাসা হইতে ছুটি নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি মোহ্তামেম সাহেবের বরাবরে যে দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন, তার বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

ঃ হযরত মোহতামেম সাহেবের খেদমতে-সালামে-মস্নুন বাদ– আমার বড় ভাই জনাব মাওলানা মুহম্মদ সাহেবের ইন্তেকালের দরুন নিজামুদ্দিনের মাদ্রাসা ও মসজিদের নেগরানীর জন্য আমার পক্ষে নিজামুদ্দিনে কিছুদিন অবস্থান করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

বন্ধু-বান্ধব এবং হিতাকাঙ্ক্ষীগণের আন্তরিক ইচ্ছা– আমি যেন এখন হইতে সেইখানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করি। আমার মরহুম হযরত ওয়ালেদ সাহেব এবং মোহ্তারম বড় ভাইজানের ঐকান্তিক চেষ্টায় দ্বীনি তালীম হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত কিছুসংখ্যক গ্রাম্য লোকের মধ্যে তালীমের ছেলছেলা জারির ফলে যে উপকার

হইয়াছে, তা দেখিয়া আমারও আগ্রহ হয়, কিছুকাল সেখানে অবস্থান করতঃ প্রতিষ্ঠানটির সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়া সেই পবিত্র খেদমতের কিছু বরকত হাসিল করি।

সেমতে আমাকে এক বৎসরের জন্য মাদ্রাসার কাজ হইতে ছুটি মঞ্জুর করিবার আবেদন পেশ করিতেছি।

বান্দা

আখতার ইলয়াস

মারাত্মক অসুস্থতা

সাহারানপুর হইতে নিজামুদ্দিন পৌছার পূর্বেই হযরত মাওলানা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। হিজরী ১৩৩৬ সনের ২০শে জমাদিউল আওয়াল তারিখে অসুস্থ অবস্থায়ই সাহারানপুর হইতে কান্দালায় পৌছিলেন। বাড়ীতে পৌছিবার পর রোগ ক্রমে মারাত্মক আকার ধারণ করিল। এক জুমার রাত্রিতে পরিবারের সকলেই তাঁহার জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়িলেন। নাড়ী বসিয়া গেল, হাত-পা সম্পূর্ণ শীতল হইয়া আসিল। সকলেই ইন্নালিল্লাহ্ পড়িতে শুরু করিলেন। কিন্তু অলক্ষ্যে থাকিয়া যিনি তাঁহার দ্বারা এক বিরাট দায়িত্ব পালন করানোর পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার রহস্য বুঝা সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়। দেখা গেল, শেষ রাত্রের দিকেই শরীর একটু গরম হইতেছে। শুশ্রূষাকারীগণের ধারণার বাহিরেই ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মাওলানা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

নিজামুদ্দিনে আগমন

কিছুটা সুস্থ হইয়াই হযরত মাওলানা কান্দালা হইতে নিজামুদ্দিন চলিয়া আসিলেন। এই এলাকাটি ছিল তখন প্রায় জনশূন্য। মসজিদের চারিদিকে ঝোপ-ঝাড় ছাড়া জনবসতি বলিতে প্রায় কিছুই ছিল না। একটি ছোট্ট পাকা মসজিদ, তৎসংলগ্ন পুরাতন জীর্ণ একটি ইমারত, মসজিদের ছোট একটি হুজরা এবং মাজারের দক্ষিণ পার্শ্বে খাদেমদের কয়েকজনের বাসস্থান; এই ছিল তখন এই এলাকার আবাদী। মসজিদেই মাদ্রাসার কাজ চলিত। মেওয়াত এবং অন্যান্য এলাকা হইতে আগত অল্প কয়েকটি গরীব তালেবে-এলেম উহাতে পড়াশোনা করিত। মাওলানা এহতেশামুল হাসান সাহেব বাল্যকালেই হযরত মাওলানার সঙ্গে নিজামুদ্দিনে চলিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন– "অনেক সময় আমি পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। হঠাৎ যদি কোনদিক হইতে দুই-

পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। হঠাৎ যদি কোনদিক হইতে দুই-একজন আগন্তুক চোখে পড়িত তবে খুশীতে অন্তর ভরিয়া উঠিত।”

মাদ্রাসার কোন সন্তোষজনক আয়ের উৎস ছিল না। আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল, সীমাহীন ধৈর্য এবং পরিচালকের অসীম সাহসই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান মূলধন। ফলে অত্যন্ত কৃচ্ছ্রতার মধ্যে সময় কাটাইতে হইত। কোন কোন সময় একটানা উপবাস দেখা দিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোন সময়ই হযরত মাওলানার চেহারায় দুশ্চিন্তার কোন লক্ষণই দেখা যাইত না। কোন কোন সময় ঘোষণা করিয়া দিতেন, আজ খাবার মত কিছু নাই। যাহাদের ইচ্ছা থাক, আর ইচ্ছা করিলে কেহ অন্য ব্যবস্থাও করিয়া নিতে পার। কিন্তু তালেবে-এলেমদের মধ্যে এমন এক রূহানী শক্তির উন্মেষ ঘটিয়াছিল যে, এত কষ্টের পরও কেহ চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইত না। অনেক সময় জংলী ফলমূল আনিয়া তা সিদ্ধ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করা হইত। সাধারণতঃ ছাত্ররাই জঙ্গল হইতে লাকড়ী সংগ্রহ করিয়া আনিত, রুটি তৈরী করিত এবং শুধু চাটনী সহযোগে খাইয়া পড়াশোনায় মনোনিবেশ করিত।

হযরত মাওলানা এই কঠোর কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবনে মোটেও ঘাবড়াইতেন না, বরং সঙ্গী-সাথীগণকে তিনি সম্মুখের সেইদিনের জন্য সদা সাবধান করিতেন– আল্লাহ্ পাকের দস্তুর অনুযায়ী কঠিন পরীক্ষার পর সাধারণতঃ যে সাফল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য আসিয়া থাকে। এই কঠিন দিনের শেষে স্বাচ্ছন্দ্যের আগমন সম্পর্কে তাঁহার অন্তরে প্রত্যয় ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়।

মাদ্রাসার ইমারত বা কোনরূপ নির্মাণকাজের প্রতি তাঁহার মোটেও কোন লক্ষ্য ছিল না। হাজী আব্দুর রহমান ছিলেন বড় ভাই হযরত মাওলানা মুহম্মদ সাহেবের প্রিয় সাগরেদ, মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র এবং তাঁহার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সঙ্গী। মেওয়াত এলাকার একটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। মাওলানা মুহম্মদ সাহেবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিজামুদ্দিনের মাদ্রাসাতেই তিনি কোরআন-হাদীসের তালীম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত মাওলানা মুহম্মদ সাহেবের জামানা হইতেই নিজামুদ্দিনের সকল এন্তেজামের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তাঁহার উপর। একবার মাওলানার অনুপস্থিতিতে হাজী আব্দুর রহমান সাহেব দিল্লীর কয়েকজন ব্যবসায়ীর সাহায্যে মাদ্রাসার জন্য কয়েকটি কামরা নির্মাণ করাইয়া ফেলেন। মাওলানা ফিরিয়া আসিয়া এত অসন্তুষ্ট হইলেন যে, কয়েকদিন পর্যন্ত হাজী সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ রাখিলেন। বলিলেন– “যখন হইতে মাদ্রাসার জন্য পাকা ইমারত নির্মিত হইতে শুরু করিয়াছে তখন হইতেই তালীম কাঁচা হইয়া গিয়াছে।”

দোয়া প্রার্থী হইলেন। মাদ্রাসার জন্য কিছু টাকা দেওয়ারও প্রস্তাব করিলেন। হযরত মাওলানা দোয়া করার আশ্বাস দিলেন; কিন্তু কোন টাকা-পয়সা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। কিন্তু হাজী সাহেব মাদ্রাসার প্রয়োজনে টাকা নিয়া নিলেন। হযরত মাওলানা এই কথা শুনিতে পাইয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং বিশেষ তাকিদ দিয়া তৎক্ষণাৎ টাকা ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন।

প্রায়ই তিনি হাজী সাহেবকে বলিতেন– “দ্বীনের কাজ টাকা-পয়সার দ্বারা চলে না। যদি তাই হইত, তবে আল্লাহ্ পাক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বিস্তর ধন-সম্পদ দান করিতেন।”

ইবাদত ও মোজাহাদা

নিজামুদ্দিনে অবস্থানের এই সময়টিতে হযরত মাওলানার জীবনে ইবাদত ও মোজাহাদার সর্বাপেক্ষা আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। জন্মগতভাবেই তাঁহার মধ্যে বন্দেগীর প্রতি আর্কষণ এবং মোজাহাদা ও সাধনার উত্তরাধিকার লাভ হইয়াছিল। নিজামুদ্দিনে আসিয়া যেন সেই প্রবণতা অনেকগুণ বাড়িয়া গেল। হাজী আব্দুর রহমান সাহেব বর্ণনা করেন– হুমায়ূনের মাকবারার উত্তর দিকে আব্দুর রহীম খান খানান এবং হযরত সৈয়দ নূর মুহম্মদ বাদায়ুনীর মাজারের মধ্যবর্তী যে স্থানটি হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়ার ইবাদতগাহ্ বলিয়া খ্যাত, অধিকাংশ সময় হযরত মাওলানা সেইখানে নিরিবিলিতে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। অনেক সময় দ্বিপ্রহরের খানা সেখানেই দিয়া আসা হইত। রাতের খানা হুজরায় আসিয়া খাইতেন। নামাজের সময় নিকটবর্তী মসজিদে আসিয়া জামাতে শামিল হইতেন। কোন কোন সময় আমরা সেখানে গিয়া জামাত করিতাম। তালেবে-এলেমগণও অনেক সময় সেখানে গিয়াই ছবক পড়িয়া আসিত।

হাদীসের দরস দেওয়ার সময় প্রথমে অজু করিয়া দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িতেন, তারপর ছবক পড়াইতে শুরু করিতেন। বলিতেন– হাদীস শরীফের হক আরও অনেক বেশি, সর্বনিম্ন হক এইটুকু। হাদীস পড়ানো অবস্থায় কোন বিশিষ্ট লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেও ছবক ছাড়িয়া তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিতেন না। ছবক শেষ করার পর আসিয়া সাক্ষাৎ দান করিতেন।

খানার সময় অতিবাহিত হইয়া অসময় হইয়া গেলেও কখনও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন না। খানার ব্যাপারে কোন ত্রুটির কথাও জীবনে কোনদিন উল্লেখ করেন নাই।

পাঠদানে একাগ্রতা

পাঠদানের ব্যাপারে হযরত মাওলানার একাগ্রতা ছিল সীমাহীন। ছবকের সময় ছোট-বড় প্রত্যেকটি ছাত্রের প্রতি গভীর মনোযোগ রাখিতেন। মাদ্রাসার সব কয়জন ছাত্রকে অনেক সময় একা একা পড়াইতেন। কোন কোন দিন নব্বইজন ছাত্রকে পাঠদান করিতেন। পড়াশোনা নিয়া এমন ব্যস্ত থাকিতেন যে, অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের দরস ফজরের নামাজের পূর্বে দিতে হইত।

হযরত মাওলানার শিক্ষা পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রত্যেকটি ছাত্রের মধ্যে নিজে নিজে কিতাব পড়িয়া তা পূর্ণমাত্রায় অনুধাবন করিবার যোগ্যতা সৃষ্টির প্রতিই তিনি বেশি জোর দিতেন। আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও সাহিত্যের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়া শিক্ষার্থীগণকে নিজে নিজে কিতাব পড়িয়া বুঝিবার যোগ্য করিয়া তুলিতেন। সাধারণতঃ অন্যান্য মাদ্রাসায় যে সমস্ত কিতাব গতানুগতিকভাবে পড়ানো হয়, তিনি তা মোটেও অনুসরণ করিতেন না। নিজের পছন্দমত অনেক নতুন নতুন কিতাব পড়াইয়া শিক্ষার্থীগণের মধ্যে স্বাধীন উদ্ভাবনী শক্তি সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেন।

তৃতীয় অধ্যায়

মেওয়াত এলাকায় তালীম ও এছলাহের সূচনা

দিল্লীর দক্ষিণাঞ্চলে যে এলাকাটিতে প্রাচীনকাল হইতে 'মেয়ো' গোত্রের লোকদের বসবাস ছিল সে বিস্তীর্ণ অঞ্চলটিকে মেওয়াত নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে পূর্ব পাঞ্জাবের গোরাগাঁও জেলা, দেশী রাজ্য আলওয়ার, ভরতপুর এবং যুক্ত প্রদেশের মথুরা জেলার এক অংশ নিয়া মেওয়াত এলাকা বিস্তৃত। ইংরেজ ইতিহাসবিদগণের মতে মেয়ো জাতি আর্যদের এই দেশে আগমনের বহু পূর্ব হইতেই এই এলাকায় বসবাস করিয়া আসিতেছে। এইদিক দিয়া এতদঞ্চলে পরে আসিয়া বসবাসস্থাপনকারী আর্য রাজপুতদের চাইতে মেয়োদের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। তবে মেওয়াত এলাকার খানজাদাদের সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা হইল যে, ইহারা বংশগত দিক দিয়া রাজপুত। ফারসী ইতিহাসগ্রন্থসমূহে 'মেওয়াতী' শব্দ এই সমস্ত রাজপুত বংশোদ্ভূত খানজাদাদের বেলাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আইনে-আকবরীর মাধ্যমে জানা যায় যে, জাট এবং রাজপুতগণের মধ্য হইতে যাহারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতেন তাঁহাদিগকে মেওয়াতী বলিয়া অভিহিত করা হইত।

তারিখে-ফিরোজশাহীতে শামছুদ্দীন আলতামাসের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতে গিয়া সর্ব প্রথম মেওয়াতের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। দিল্লীতে মুসলিম শাসনের সূচনা যুগে মেওয়াতীগণ অত্যন্ত উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। রাজপুতনা হইতে দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত সুবিস্তৃত ঘন বনরাজীর মধ্য দিয়া মেওয়াতীগণ বারবার দিল্লী শহরের উপর অভিযান চালাইয়া লুণ্ঠতরাজ করিতে শুরু করে। এই সমস্ত দুঃসাহসী অভিযানকারীদের ভয়ে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই শহরের সকল ফটক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। সূর্যাস্তের পর আর কোন নগরবাসী শহরের বাহিরে যাওয়ার সাহস করিত না। রাত্রের অন্ধকারে উহারা কোননা কোন উপায়ে শহরে ঢুকিয়া পড়িত এবং ইতস্ততঃ লুটের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইত। ফলে শহরবাসীগণ উহাদের ভয়ে সদাসন্ত্রস্ত জীবন-যাপন করিত। গিয়াসউদ্দীন বলবন সর্বপ্রথম উহাদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক অভিযান প্রেরণ করেন। সুলতানের সৈন্যবাহিনীর হাতে বিপুল সংখ্যক মেওয়াতী নিহত হয়। তাছাড়া নগর জীবনের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে সুদক্ষ আফগান প্রহরী নিয়োগ করা হয়। সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বনভূমি পরিষ্কার করিয়া শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা হয়। এরপর প্রায় একশতাব্দীকালের মধ্যে মেওয়াতীদের সম্পর্কে ইতিহাসে আর কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

দীর্ঘ একশতাব্দী পর কয়েকজন দুঃসাহসী মেওয়াতী সর্দার দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষকে পুনরায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। দিল্লী কর্তৃপক্ষকে বারবার তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিতে হয়। এই সমস্ত আগ্রাসী সর্দারগণের মধ্যে বাহাদুর নাহির এবং তাঁহার কয়েকজন উত্তরাধিকারীর নাম একাধিকবার ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে। এই দুর্ধর্ষ সর্দার স্বীয় যোগ্যতা বলে মেওয়াতে একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রশক্তি কায়েম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত দিল্লী কর্তৃপক্ষের মোকাবেলায় দীর্ঘ সংঘর্ষের পরও একটি করদরাজ্য হিসাবে দীর্ঘকাল উহা স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

খানজাদাদের মধ্যে লক্ষীপাল নামক জনৈক মেওয়াতী সর্দার সমগ্র মেওয়াতসহ পাশের কয়েকটি এলাকার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ফিরোজশাহের আমলদারীতে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

মেয়ো সম্প্রদায় কখন ও কিভাবে ইসলাম কবুল করিয়াছিল– তারা কি কোন এক সময়ে বিশেষ কোন কারণে একই সঙ্গে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল না পর্যায়ক্রমে– সেই ইতিহাস আজ আর জানার কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র নাই। আশ্চর্যের বিষয়, ইতিহাস লেখার নামে যাঁহারা শুধু রাজরাজরাদের যুদ্ধ-অভিযান এবং পরস্পরের গৃহযুদ্ধের সবিস্তার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, আমাদের সেইসব ইতিহাসবিদগণের দৃষ্টিতে বিরাট মেয়ো সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ লোকের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ঘটনাটি কোনই গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

মেওয়াতীদের দ্বীনি হালাত

মুসলিম সমাজপতি এবং দায়িত্বশীল লোকদের সুদীর্ঘ উপেক্ষার ফলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকার অধিবাসী মেয়ো মুসলমানগণ ধীরে ধীরে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলো হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়া অজ্ঞানতা, কুসংস্কার এবং ধর্মহীনতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া যায়। এতদসঙ্গে উপমহাদেশের বৃহত্তর মুসলিম সমাজের সঙ্গে তাহাদের সামাজিক ও তামদ্দুনিক সম্পর্কটুকুও সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া যায়। মুসলিম মিল্লাতের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে হারাইয়া যাওয়া এই বিরাট জনসংখ্যাটি সম্পর্কে কোন মুসলিম সমাজপতি বা ইতিহাসবিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইলেও মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিহীন অমুসলিম কতিপয় মনীষীর দৃষ্টিতে তা কিছু কিছু অবশ্যই বিধৃত হইয়াছে।

ঊনিশ শতকে আলওয়ার রাজ্যে প্রধান জরিপ কর্মকর্তা হিসাবে কার্যরত মেজর পাওলেট ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আলওয়ার গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন,

মেয়ো সম্প্রদায়ের সকলেই ধর্মে মুসলমান, তবে নামে মাত্র। কেননা, হিন্দুদের গ্রাম্য দেবতাকে ইহারাও দেবতা বলিয়া মান্য করে। হিন্দুদের কয়েকটি ধর্মীয় উৎসবও ইহারা উৎসাহের সঙ্গে পালন করিয়া থাকে। হোলি ইহাদের পক্ষে আনন্দ এবং রংতামাশার উৎসব। মোহররম, ঈদ এবং শবে বরাতের ন্যায় সমান গুরুত্ব সহকারেই তাহারা হোলি উৎসবও পালন করে। অনুরূপভাবে জন্মাষ্টমী, দশেরা এবং দোয়াবী উৎসবেও তাহারা সমভাবে শরীক হয়। নামকরণ, বিবাহের দিন-তারিখ নির্ণয় এবং কুষ্টি-ঠিকুজী বিচারের জন্য তাহারাও হিন্দুদের ন্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সরণাপন্ন হয়। একমাত্র 'রাম' শব্দটি বাদ দিয়া উহারা হিন্দুদের ব্যবহৃত নামেই সাধারণতঃ নিজেদের নামকরণ করিয়া থাকে। ইহাদের নামের পিছনে খানের তুলনায় সিং শব্দের ব্যবহারও কম নয়। অমাবস্যার সময় হিন্দু আহির এবং গোজরদের ন্যায় মেয়োরাও কাজকর্ম হইতে বিরত থাকে। নতুন কূপ খনন করিবার সময় প্রথমে তাহারাও হনুমান দেবতার নামে একটি হাউজ নির্মাণ করিয়া থাকে। তবে কখনও লুটতরাজ করিবার মতলব হইলে হিন্দু দেবস্থানের প্রতি তাহাদের সকল ভক্তি-শ্রদ্ধা নিঃশেষে উবিয়া যাইতে দেখা যায়। মন্দির বা দেবস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করিবার কথা উত্থাপিত হইলে তাহারা বুকে টুকা দিয়াই বলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা হিন্দু নয়; মুসলমান!

মেয়োরা নিজেদের ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাহাদের খুব কম লোকেই কলেমা বলিতে পারে। নিয়মিত নামাজ পড়িবার মত লোকের সংখ্যা নাই বলিলেই চলে। নামাজের মাসআলা-মাসায়েল এমনকি সময় সম্পর্কেও তাহাদের কোন ধারণা নাই।

গেজেটিয়ারে উল্লিখিত উপরোক্ত বিবরণটি আলওয়ার রাজ্যে বসবাসকারী মেয়ো সম্প্রদায়ের পরিচিতি প্রদান উপলক্ষে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তবে গোরাগাঁও জেলার মধ্যে বসবাসকারী মেয়োদের অবস্থা অবশ্য কিছুটা উন্নত ছিল। কয়েকটি মাদ্রাসার বদৌলতে সেই এলাকার কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে কলেমা, নামাজ প্রভৃতি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা বিদ্যমান ছিল। ইহাদের বিবাহ-শাদি উপলক্ষে প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মারফত সম্পন্ন হইলেও 'আকদ' কাজীর দ্বারাই পড়ানো হইত।

এই সমস্ত এলাকার পুরুষেরা সাধারণতঃ ধূতি-গামছা ব্যবহার করিত; পাজামার ব্যবহার কোথাও দেখা যাইত না। পুরষদের মধ্যেও স্বর্ণের অলংকার পরিধান করিবার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল।

গেজেটিয়ারের লেখক অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছেনঃ "মেয়ো সম্প্রদায় চাল-চলনের দিক দিয়া আধা হিন্দু। তাহাদের গ্রামে মসজিদ খুব কমই নজরে পড়ে।

তেজারা তহসীলের অধীন মেয়োদের বায়ান্নটি গ্রামের মধ্যে মাত্র আটটি মসজিদ রহিয়াছে। প্রতিবেশী হিন্দুদের যেমন দেবস্থান রহিয়াছে, তেমনি মেয়োদেরও প্রতি গ্রামে 'পাঁচপীরা' ভঁইসাচাহেও প্রভৃতি এমন কতগুলি 'পবিত্র স্থান' সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে, যেগুলিতে তাহারা পশু কুরবানী করে এবং মানত ইত্যাদি পৌঁছাইয়া থাকে। শবে বরাতে প্রত্যেকটি মেয়ো বস্তিতে সৈয়দ সালার মসউদ গাজীর পতাকার পূজা দেওয়া হয়।"

১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গোরাগাঁও জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হইয়াছে- "মেয়ো সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত উদাসীন এবং স্বধর্ম ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে খুবই অমনোযোগী। হিন্দুধর্মের অধিকাংশ উৎসবাদিতেও তাহারা সমান উৎসাহে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। মনে হয়, তাহাদের নীতি হইল উৎসব-আনন্দ উভয় ধর্মেরই পালন কর, কিন্তু কোন ধর্মেরই ধর্মীয় কর্তব্য পালন করিও না।"

ইদানীং কালে অবশ্য মেয়োদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহাদের প্রাণান্তকর চেষ্টার ফলে ইহাদের কিছু কিছু লোক রোজা রাখিতে শুরু করিয়াছে। গ্রামে মসজিদ নির্মাণ করিয়া নামাজেও অভ্যস্থ হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে এখন হিন্দু নারীদের পোশাক ঘাগরার পরিবর্তে পাজামা পরার অভ্যাসও গড়িয়া উঠিতেছে। নিঃসন্দেহে এইসব ধর্মীয় পুনর্জ্জাগরণের লক্ষণ।

ভরতপুর গেজেটিয়ারে আছে- মেয়োদের আচার-অনুষ্ঠান হিন্দু ও মুসলিম আচার-অনুষ্ঠানের একটি সম্মিলিত রূপমাত্র। ইহারা ছেলেদের খতনা করায়, বিবাহ করে এবং মৃতদেহ দাফন করিয়া থাকে। সৈয়দ সালার মসউদ গাজীর মাজার জেয়ারত করার উদ্দেশ্যে বেহরাঈদ নামক স্থানে নিয়মিত সমবেত হয়। গাজী পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া তাহারা যে শপথবাণী উচ্চারণ করে, উহাকে অত্যন্ত পাক্কা অঙ্গিকার বলিয়া মনে করে। এই অঙ্গিকার পূর্ণ করাকে তাহারা প্রধান ধর্মীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। হিন্দুস্থানের অন্যান্য পূণ্যস্থানেও তাহারা যাতায়াত করে, কিন্তু কখনও হজ্ব করিতে যায় না।

হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ইহারা হোলি এবং দীপালী পূজায় অংশ গ্রহণ করে, এক গোত্রের মধ্যে বিবাহ-শাদির আদান-প্রদান করে না, কন্যাসন্তানকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ দেয় না এবং শিশুদের নাম রাখিবার সময় হিন্দুয়ানী এবং মুসলমানী নাম মিলাইয় নামকরণ করে।

মেয়োদের প্রায় সবাই মূর্খ এবং অমার্জিত। সমাজে বহুরূপী ও গায়কদের খুবই সমাদর দেখা যায়। গ্রাম্য জীবন এবং কৃষিকার্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত

অনেক চতুর্পদী গীতি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে এই সমস্ত তাহাদের মধ্যে গীত হইতে শুনা যায়। ইহাদের ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং কর্কশ ধরনের। ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উত্তেজক ও নেশাদ্রব্য ব্যবহারেরও ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। ইহারা অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও দুর্বল বিশ্বাসের লোক। শুভ-অশুভ খুব বেশি মানিয়া চলে। প্রাচীনকাল হইতে ইহারা তস্কর ও লুটেরা হিসাবে খ্যাত ছিল। আজকাল অনেকটা পরিবর্তন আসিবার পরও গৃহপালিত পশুর পাল বা গরু-ছাগল চুরি করিয়া নিয়া যাওয়ার ব্যাপারে ইহাদের দক্ষতা সম্পর্কে নানা জনশ্রুতি শুনা যায়।

মেওয়াতীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য

ধর্মীয় ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অধঃপতন হওয়া সত্ত্বেও মেওয়াতীদের মধ্যে কতগুলি উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়- যা সাধারণতঃ কোন উন্নত ও মহৎ কৃষ্টিবান জাতির উত্তরাধিকার বলিয়া অনুমিত হয়। কালক্রমে ইহারা যেসমস্ত অনাচার এবং কুসংস্কারে ডুবিয়া গিয়াছে, মনে হয়- মূর্খতা, দারিদ্র্য, চর্চার অভাব এবং সুসভ্য জনসমাজ হইতে দূরে অবস্থান করার কারণে অনেক সুসভ্য ও উন্নত জাতিও যেমনভাবে ধীরে ধীরে পতনের গভীর পংকে ডুবিয়া যায়, মেয়োদের বেলাতেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দেখা যায়, বর্বরতা যুগের আরবদের মধ্যেও ঠিক একই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। পরিবেশের কারণে বীরত্ব ও আত্মপ্রত্যয় শেষ পর্যন্ত লুণ্ঠন ও তস্করবৃত্তির পথে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল। অসীম সাহস ও বীরত্ব প্রকাশের কোন সঙ্গত ময়দান না থাকায় নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানাহানি এবং গৃহযুদ্ধের আকারে তা প্রকাশিত হয়। প্রকৃতিদত্ত মর্যাদাবোধ ও আত্মসম্মান প্রকাশের কোন উপযুক্ত স্থান না থাকাতে জাহেলিয়াত-সুলভ অলীক আত্মসম্মানবোধ এবং স্বআরোপিত শরাফত ও মর্যাদার হেফাজতের নামে তা ব্যয় হইতে থাকে। এক কথায়, প্রকৃতিগত যোগ্যতা ও জাতীয় মেধার গঠনমূলক কোন প্রয়োগক্ষেত্র না থাকার ফলে হিংসা, অনাচার এবং কুসংস্কারের পথে তা ব্যয়ীত হওয়াই যেমন স্বাভাবিক, যুগ-যুগের অজ্ঞানতা-অন্ধকারে ডুবিয়া থাকা মেয়োদের জাতীয় জীবনেও তার পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল মাত্র। জাতি নিঃসন্দেহে মেধাসম্পন্ন এবং প্রকৃতিগতভাবে যোগ্যতার অধিকারী ছিল- তবে সমস্ত যোগ্যতারই প্রয়োগক্ষেত্র ছিল ভুল, গতি ছিল ভ্রান্ত।

সরলতা, শ্রমপ্রিয়তা এবং সংকল্পে দৃঢ়তা ছিল মেয়োদের গোত্রগত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই বোধহয় অনেক ঝড়-তুফানের মধ্যেও ইহারা নিজেদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য এবং অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইসলামের মূল

শিক্ষা হইতে বহু দূরে সরিয়া যাওয়ার পরও মেয়োদের মধ্য হইতে একটি লোক ধর্মান্তরিত হইয়াছে এইরূপ কোন ঘটনার কথা শুনা যায় নাই। অথচ ইহাদিগকে ধর্মান্তরিত করিবার ব্যাপক প্রচেষ্টা বারবারই চালানো হইয়াছে। আশপাশের অন্যান্য এলাকায় সেই প্রচেষ্টার ফলে অনেক ভাঙ্গা-গড়া ও উত্থান-পতন সূচীত হইয়াছে; কিন্তু মেওয়াতীদের মধ্যে সেই সমস্ত প্রচেষ্টা কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে, সুদীর্ঘকাল যাবৎ উপমহাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান দিল্লীর অতি নিকটে অবস্থান করিয়াও নতুন কোন সভ্যতা বা জীবনযাত্রা প্রণালী দ্বারা ইহারা প্রভাবিত হয় নাই। জাতিগতভাবে ইহাদের মন-মানস এবং মেধা সম্পূর্ণ অনাবাদী রহিয়া গিয়াছে। মানসিক শক্তির কোন প্রকার অপচয় না ঘটার ফলে ইহাদের মধ্যে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বিরাজ করিতেছিল, যুগ যুগ পরে হযরত মাওলানা ইলয়াসের ন্যায় একজন যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষের জীয়নকাঠির ছোঁয়ার অপেক্ষাতেই তা এমনভাবে অনাবাদী ও উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল কি না কে জানে?

মেওয়াতীদের আসা-যাওয়ার সূচনা

আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মেওয়াতের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছিল হযরত মাওলানা মুহম্মদ ইসমাইল সাহেবের জামানাতেই। আল্লাহ্ পাক গায়েবী এন্তেজামের দ্বারাই হয়ত হযরত মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াসের নেজামুদ্দিনে আগমনের বহু পূর্ব হইতেই মাওলানা মুহম্মদ ইসমাইল সাহেবকে মেওয়াতের দ্বারপ্রান্তে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রচেষ্টায় বিস্তীর্ণ মেওয়াতভূমির স্থানে স্থানে এই খান্দানের ভক্ত-অনুরক্তগণের একটি উল্লেখযোগ্য জামাত সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। সুদীর্ঘকালে দিল্লীর শাসনকতৃপক্ষ বিপুল শক্তি ব্যয় করিয়াও যে মেওয়াতীদের মন-মানসে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই, দুইজন নিঃস্ব দরবেশ পুরুষের হাতেই সেই দুর্ধর্ষ মেওয়াতবাসীগণ শেষ পর্যন্ত আকুল আগ্রহে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

মাওলানা মুহম্মদ ইসমাইল এবং মাওলানা মুহম্মদ সাহেবের মেওয়াতী মুরীদগণ যখন জানিতে পাইলেন যে, নিজামুদ্দিনের শূন্য আস্তানায় তাঁদের পূর্বোক্ত বুজুর্গগণেরই সুযোগ্য এক উত্তরাধিকারী মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস অবস্থান করিতেছেন, তখন তাহারা নতুন করিয়া নিজামুদ্দিনে যাতায়াত শুরু করিল। প্রথমেই আসিয়া তাহারা হযরত মাওলানাকে খান্দানের ভক্ত-অনুরক্তগণকে সান্ত্বনাদানের উদ্দেশ্যে মেওয়াত সফর করার আমন্ত্রণ পেশ করিল।

সান্ত্বনাদানের উদ্দেশ্যে মেওয়াত সফর করার আমন্ত্রণ পেশ করিল।

মেওয়াতের বিপুলসংখ্যক কুসংস্কারগ্রস্ত জনগণের জন্য হযরত মাওলানার অন্তরেও যথেষ্ট ভাবনা ছিল। বহু চিন্তা-ভাবনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, একমাত্র দ্বীনি শিক্ষার আলোকধারা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করার মাধ্যমেই এই জনগোষ্ঠীর অন্তর হইতে সকল আনাচারের জমাট বাঁধা অন্ধকার দূরিভূত করা সম্ভব।

মাওলানা মুহম্মদ ইসমাইল সাহেব এবং তারপর মাওলানা মুহম্মদ সাহেবও এই একই পদ্ধতিতে ইহাদের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। মেওয়াতের দরিদ্র কৃষকদের কিছুসংখ্যক সন্তানকে নিজামুদ্দিনের সেই ক্ষুদ্র মসজিদটিতে রাখিয়া দ্বীনি তালীম দেওয়ার পর তাহাদিগকে স্ব স্ব এলাকায় ইসলামী শিক্ষার আলো বিস্তার করিবার জন্য তাঁহারাই সর্বপ্রথম প্রেরণ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, ইহাদের প্রচেষ্টাতেই স্থানে স্থানে কিছু দ্বীনের রৌশনী প্রজ্বলিত হইতে শুরু করিয়াছিল। হযরত মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস আরও এক কদম অগ্রসর হইয়া মেওয়াত এলাকার অভ্যন্তরভাগে দ্বীনি-মাদ্রাসা কায়েমের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। এক একটি মারকাজ-হিসাবে একটি মাদ্রাসা কায়েম করিয়া সেই সমস্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে আশপাশের লোকজনদের মধ্যে দ্বীনি-তালীমের ব্যাপক প্রচলন করাই ছিল হযরত মাওলানার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। তাঁর একান্ত বিশ্বাস ছিল যে, এই পদ্ধতিতেই পশ্চাদপদ মেওয়াতবাসীদের মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন সাধন সম্ভব হইবে।

দাওয়াত কবুল করার জন্য শর্ত

কোন পীর বা পীরজাদার পক্ষে খান্দানী মুরীদগণের এলাকায় যাওয়া এবং গতানুগতিকভাবে দোয়া-খায়ের এবং হাদিয়া-তোহ্ফা কবুল করিয়া ফিরিয়া আসিবার সনাতন রীতি সম্পর্কে হযরত মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস ভালভাবেই ওয়াকেবহাল ছিলেন। কিন্তু পীরি-মুরিদীর সেই সুপরিচিত প্রথা তাঁহার উদ্দেশ্য পূরণের পথে মোটেও সহায়ক ছিল না। তিনি অধঃপতিত মেওয়াতবাসীদের দ্বীনি-জিন্দেগীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাঁর সফরের মাধ্যমে সেই পরিবর্তনকে একধাপ আগাইয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে, সর্বোপরি স্থায়ী হেদায়েতের উৎস হিসাবে এই সফর উপলক্ষে কিছুসংখ্যক দ্বীনি মাদ্রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা লইয়া তিনি ভক্তদের দাওয়াত কবুল করিতে সম্মত হইলেন।

মাওলানা নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন– প্রথমবার যখন কিছুসংখ্যক ভক্ত অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাকে মেওয়াত নিয়া যাওয়ার জন্য ধরিয়া পড়িল, তখন আমি

শর্ত আরোপ করিলাম- তোমরা অঙ্গীকার কর, আমার যাওয়া উপলক্ষে তোমাদের এলাকায় মক্তব কায়েম করিবে।

সেইসময় মেওয়াতবাসীগণ মক্তব প্রতিষ্ঠাকে এমন অসম্ভব এবং অবাস্তব ব্যাপার বলিয়া মনে করিত যে, এর চাইতে কঠিন কোন শর্ত তাহাদের জন্য ছিল না। বিশেষতঃ দরিদ্র কৃষিজীবী মেওয়াতীদের সন্তান-সন্ততিগণকে কাজকর্ম হইতে সারাইয়া আনিয়া মক্তবে বসানোর পরিকল্পনাকে যেন তাহারা একধরনের বড়লোকী বিলাস বলিয়া মনে করিত। তাই মক্তব প্রতিষ্ঠার শর্তের কথা শুনিয়া দাওয়াত প্রদানকারীগণের উৎসাহে অনেকটা ভাটা পড়িয়া গেল। এমন কোন শর্ত করিবার অঙ্গীকার করিতে তাহারা সম্মত হইল না। মাওলানাও এই শর্ত ব্যতিরেকে দাওয়াত কবুল করিতে রাজী হইলেন না। কয়েকবারই লোকজন দাওয়াত করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়া এই কঠিন শর্তের টানাপোড়েনে ফিরিয়া গেল। শেষ পর্যন্ত কিছুসংখ্যক চিন্তাশীল লোক স্থির করিলেন যে, মাওলানার শর্ত মানিয়াই একবার তাঁহাকে এলাকায় নিয়া যাওয়া হউক। সরেজমিনে অবস্থা দেখিলে হয়ত শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেও নিরাশ হইয়া এইরূপ পরিকল্পনা কার্যকরি করিবার এই অটল সিদ্ধান্ত হইতে বিরত হইবেন।

ভক্তদের অনুরোধে হযরত মাওলানা মেওয়াত সফরে গেলেন। সেখানে যাইয়াই তিনি তাঁহার শর্ত পূরণ করিবার জন্য তাকিদ এবং কিছু সংখ্যক লোকের প্রাণান্তকর চেষ্টায় প্রথমে একটি মক্তব কায়েম হইল। এই মক্তব হইতেই শেষ পর্যন্ত একের পর এক মক্তব প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়া গেল।

হযরত মাওলানা মেওয়াতের জনসাধারণকে বলিতেন- তোমরা ছেলে দাও, শিক্ষকের বেতন এবং অন্যান্য খরচের ব্যবস্থা আমি করিব। গরীব মেওয়াতী কৃষক সম্প্রদায় কৃষিকাজ ও গরু-ছাগলের দেখাশোনা ছাড়িয়া ছেলে-মেয়েদিগকে কিতাব হাতে মক্তবে প্রেরণ করিবার কথা চিন্তাই করিতে পারিত না। শিক্ষার প্রতি কোন আগ্রহ বা প্রয়োজনীয়তাই তাহারা অনুভব করিত না। শিশুকাল হইতে গরু-ছাগল চরানো এবং অবশিষ্টকাল কৃষিকাজের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিবার সনাতনী জীবনধারার মধ্যেই তাহারা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। যুগযুগের এই জীবনধারার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করা সহজসাধ্য ছিল না। প্রথম প্রথম নানা কৌশলে তাহাদিগকে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইত। অনেক সাধ্য-সাধনার পরই কোন কৃষককে মক্তবে ছেলে পাঠাইতে রাজী করা যাইত।

মাওলানার প্রথম সফরে দশটি মক্তব কায়েম হইল। তারপর অবশ্য এমন দিন আসিয়াছিল- যখন একদিনের মধ্যেও কয়েকটি মক্তব কায়েম হইয়াছিল। এইভাবেই বিস্তীর্ণ মেওয়াতভূমির দিকে দিকে দাবানলের ন্যায় মক্তব শিক্ষার

ব্যাপক প্রচলন হইয়া যায়। এই সমস্ত মক্তবে কোরআন শরীফ এবং প্রাথমিক মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

হযরত মাওলানা প্রত্যেকটি দ্বীনি কাজকে সম্পূর্ণ নিজের কাজ বলিয়া মনে করিতেন। প্রথম যখন তিনি মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তবলীগের কাজ শুরু করেন, তখন এই কাজকে তথাকথিত কোন সামাজিক কাজ বা জাতীয় কাজ মনে করিয়া শুরু করেন নাই, সম্পূর্ণ নিজের কাজ হিসাবেই তিনি দ্বীনের খেদমত শুরু করেন। তাই দ্বীনি কাজে নিজের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত ব্যয় করিয়া দিতে তিনি মোটেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার মতে দ্বীনের কাজের সংজ্ঞা ছিল, প্রত্যেকটি লোক যেমন নিজের ঘর-সংসারের কাজে তার সময় এবং সম্পদ নিয়োজিত করে, ঠিক তেমনি দ্বীনের কাজেও সর্বপ্রথম তাহার নিজের মূল্যবান সময় ও সম্পদ ব্যয় করিবে। একবার জনৈক ভক্ত এই বলিয়া কিছু টাকা তাঁহার খেদমতে পেশ করিল যে, টাকাগুলি তাঁহার একান্ত নিজের প্রয়োজনে যেন ব্যয় করা হয়। তিনি জবাব দিলেন, ভাই! আল্লাহর কাজকে যদি আমরা নিজের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়া মনে করিতে না পারি তবে আমাদের নিজের বলিয়া আর কি অবশিষ্ট থাকে? কথা কয়টি বলিতে বলিতে হযরত মাওলানার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন, "হায়! আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শের কোন মূল্যায়নই করিয়া দেখিলাম না।"

এই ছিল হযরত মাওলানার সারা জীবনের আদর্শ। মেওয়াতের দ্বীনি কাজে সর্বপ্রথম তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় এবং যাকিছু তাঁহার নিকট হাদিয়া- তোহফা আসিত সেইসব ব্যয় করিয়া তারপর প্রয়োজনবোধে অন্যের সাহায্য কবুল করিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়

যে মহৎ গুণটি সম্বল করিয়া হযরত মাওলানা সম্পূর্ণ শূন্যের কোঠা হইতে এতবড় একটি দ্বীনি তাহরিককে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌছাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তা ছিল তাঁর তুলনাবিহীন সৎ সাহস।

দ্বীনের খেদমত এবং জাতির মধ্যে নবজাগরণ-প্রচেষ্টার কোন প্রাথমিক স্তরেই তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেন না। যে পর্যন্ত উদ্দিষ্ট মঞ্জিল সম্পূর্ণরূপে সম্মুখে আসিয়া ধরা না দিত, সেই পর্যন্ত তাঁহার বেকরার দিলের মধ্যে শান্তি আসিত না।

মক্তবের মাধ্যমে দ্বীনি তালীমের যেটুকু কাজ চলিতেছিল, সেইটুকুতে তৃপ্ত হইয়া বসিয়া থাকা নানা কারণেই তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। তাঁহার অনুভূতিপ্রবণ মনে বার বারই কেবল জাগিতে লাগিল যে, স্থানে স্থানে কিছু লোক দ্বীনের তালীম পাইবে আর অবশিষ্ট বৃহত্তর জনসাধারণ যেই তিমিরে সেই তিমিরেই ডুবিয়া থাকিবে– এই অবস্থায় জাহেলিয়াতের অন্ধকার হইতে জাতিকে টানিয়া তোলা কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? ব্যাপক জনমনে যদি দ্বীনের প্রতি মহব্বত এবং আগ্রহের সৃষ্টি করা না যায় তবে ক্ষুদ্র মক্তবগুলিরই বা ভবিষ্যত কি? সর্বোপরি মূর্খতার যে জমাটবাঁধা অন্ধকার, তার প্রভাব খোদ মক্তবগুলিকেও প্রভাবিত করিয়া দেওয়া স্বাভাবিক। কেননা, প্রথমতঃ মক্তবের স্বল্প পরিসরের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার পরিপূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ যে সব শিশু মক্তবের মধ্য হইতে যৎসামান্য দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বাহির হয় তাহারাও চারিদিকে ব্যাপ্ত কুসংস্কার ও মূর্খতার অন্ধকারে কিছুদিন হাবু-ডুবু খাইয়া শেষ পর্যন্ত চিরদিনের মত হারাইয়া যাইতে বাধ্য হয়। তৃতীয়তঃ বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে দ্বীনের প্রতি দরদ ও অনুভূতি না থাকায় ছেলে-মেয়েদিগকে আগ্রহ সহকারে মক্তবে পাঠানো এবং এই শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব বড় একটা দেখা যায় না। হযরত মাওলানা এক পত্রে এই বিষয়টির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন– "যে অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার পর মক্তবগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে, এখনও সেই মঞ্জিল বহু দূরে। সুতরাং ব্যাপকভাবে তবলীগের মেহনত করিয়া জনসাধারণকে দ্বীনের প্রতি দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট করার কাজ আরও দ্রুততর করিতে হইবে।"

চতুর্থতঃ– মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের মধ্যে দ্বীনের তালীম দেওয়ার কিছুটা ব্যবস্থা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু যেসব প্রাপ্তবয়স্ক লোক

দীর্ঘকালের ধর্মহীনতার কালো পর্দায় আবৃত হইয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে দ্বীনের পথে ডাকিয়া আনার কাজ মক্তব্যের মাধ্যমে পূর্ণ হওয়ার আশা ছিল না। কারণ, সংসারের কাজকর্ম ছাড়িয়া তাহাদের পক্ষে আসিয়া মক্তবে ভর্তি হওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে মক্তব তাহাদের জীবনে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে সক্ষম হইল না।

মাওলানার অন্তরে এই ধরনের ভাবনা-চিন্তার যখন দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, ঠিক সেইসময়েই মেওয়াতের এক সফরের মধ্যে একটি সুবেশধারী যুবককে খুব তারিফ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করতঃ বলা হইল যে, আমাদের প্রতিষ্ঠিত মক্তব হইতে এই যুবকটি উত্তমরূপে কোরআন পাঠ সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়াছে। মাওলানার দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত গভীর; তিনি লক্ষ্য করিলেন, কথিত যুবকটির দাড়ি কামানো, চেহারা-ছুরত বা লেবাস-পোশাকে তাহাকে মুসলমান হিসাবে চিনিবার কোনই উপায় নাই। এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার অনুভূতিপ্রবণ মনের মধ্যে নতুন আর একটি প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিল। এখানে বসিয়াই মনে মনে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, বৃহত্তর জনসমাণের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন না করিয়া শুধুমাত্র মাদ্রাসার মাধ্যমে দ্বীনি পরিবেশ গড়িয়া তোলার স্বপ্ন সফল হওয়া সম্ভব নয়।

মেওয়াতের জনসাধারণের মধ্যে সংস্কার সাধনার অংশ হিসাবে মক্তব প্রতিষ্ঠা ছাড়াও হযরত মাওলানা তাঁহার বিভিন্ন সফরে দীর্ঘকালের গোত্রীয় ঝগড়া-ফাসাদ এবং পারিবারিক কলহ-বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং রূহানীয়াতের গুণে এই ক্ষেত্রেও মাওলানা আশাতীত সাফল্য লাভ করেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া আত্মকলহ এবং পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত অনেক খান্দানই তাঁহার হস্তক্ষেপের ফলে পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যায়। মেওয়াতের লোকেরা বলাবলি করিত– "কি আশ্চর্য এই লোকটি! দেখিতে কয়েকটি হাড়গোড়ের সমষ্টি একটি কঙ্কাল মাত্র, অথচ যে কোন কঠিন ব্যাপারে হাত দিলেও অবলীলাক্রমে তা শেষ করিয়া ছাড়েন। তাঁর মুখের কথার মধ্যে যে কি মন্ত্র নিহীত আছে, অনেক্ জেদী-হঠকারী লোকও তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গেই নমনীয় না হইয়া পারে না।"

এই সময় হিন্দুস্থানের আরও কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট আলেম মেওয়াত এলাকায় ওয়াজ-নসিহত শুরু করিয়াছিলেন। এই দেশের সাধারণ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ওলামাদের পক্ষ হইতে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযান এবং দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই মেওয়াত এলাকার সংস্কার সাধনের কাজে অনেকেই অগ্রসর হন। কিন্তু এই সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টায় স্থানে স্থানে

কিছু কিছু কাজ হইলেও ব্যাপক কোন পরিবর্তনের আশা দেখা গেল না। একটি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়া দেখা গেল, আরও শতটা অনাচার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। ইহাদের ঈমান-এক্বীনের ময়দানে শতাব্দীব্যাপী যে জঞ্জাল আসিয়া জমা হইয়াছে, তা সম্পূর্ণরূপে ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করা না গেলে এই জাতির আংশিক সংস্কার প্রচেষ্টা কোন অবস্থাতেই যে সাফল্যলাভ করিবে না, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নামিয়া হযরত মাওলার অন্তরে এই প্রত্যয় ক্রমেই দৃঢ়তর হইয়া উঠিল।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সুদীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা সম্মুখে নিয়া মাওলানা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ব্যক্তিবিশেষ বা বিশেষ কোন শ্রেণীর লোকের এসলাহ্ এবং দ্বীনি জীবনে তরক্কী সাধনের দ্বারা সার্বিক সংস্কারের লক্ষ্যে পৌঁছা যাইবে না। তাঁর এই উপলব্ধিটুকু একজন মেওয়াতী তার সহজাত সরল ভাষায় এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ "যে পর্যন্ত সর্বসাধারণের মধ্যে দ্বীনের উপলব্ধি পরিপূর্ণরূপে না আসিবে, সেই পর্যন্ত কোন পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা নাই।"

পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই দীর্ঘ কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। হযরত মাওলানা নিয়মিত মেওয়াত এলাকায় আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় জাগরণের ময়দান ক্রমেই তৈরী হইয়া আসিতে লাগিল। এই যাতায়াতের ভিতরেই বিপুল সংখ্যক লোক তাঁহার কাছে মুরীদ হইলেন। হিজরী ১৩৪৪ সনের রবিউল আওয়াল মাসে হযরত মাওলানা এবং তাঁহার বিপুল সংখ্যক মেওয়াতী ভক্তের একান্ত অনুরোধে হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী ওলামা-বুজুর্গগণের এক জামাতসহ মেওয়াত সফরে আসিতে সম্মত হইলেন। ফিরুজপুর নামক স্থানে মাহ্‌ফিলের ব্যবস্থা করা হইল। এই উপলক্ষে এত বড় জনসমাবেশ হইয়াছিল যে, ইতিপূর্বে মেওয়াতের ইতিহাসে এত লোক একত্রিত হওয়ার আর কোন নজীর নাই। অগণিত লোক এই উপলক্ষে হযরত সাহারানপুরীর হাতে রায়আত হন।

দ্বিতীয় হজ্ব ঃ কাজের ধারা পরিবর্তন

হিজরী ৪৪ সনের শওয়াল মাসে হযরত মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস হযরত ছাহারানপুরীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার হজ্বে গমন করেন। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ভক্তগণের অনুরোধে এই কাফেলা এক সপ্তাহ সেখানে অবস্থান করে।

হজ্বের পর তাঁহারা মদীনা শরীফ চলিয়া যান। মদীনায় অবস্থানের মুদ্দত শেষ হইয়া আসার পর সঙ্গী-সাথীগণ দেশে ফিরিয়া আসার প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু

হযরত মাওলানা তখন কি যেন এক অস্থিরতায় ভুগিতেছিলেন। সঙ্গীগণের পক্ষ হইতে বার বার তাকিদ দেওয়ার পরও তিনি মদীনা শরীফ হইতে ফিরিয়া আসিতে সম্মত হইলেন না। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করার পর সঙ্গীগণ হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহেবের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিলেন। হযরত সাহারানপুরী মাওলানার অবস্থা দেখিয়া সঙ্গীগণকে বলিলেন, তোমরা ইহাকে এখান হইতে নিয়া যাওয়ার ব্যাপারে বেশি তাকিদ করিও না। এখন ইহার উপর একটি বিশেষ অবস্থা বিরাজ করিতেছে। যে পর্যন্ত তিনি নিজের তরফ হইতে রওয়ানা না হন, সেই পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর আর তা সম্ভব না হইলে চলিয়া যাও; তিনি পরে আসিবেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সঙ্গীগণ মাওলানার অপেক্ষায় রওয়ানা বিলম্বিত করিলেন।

হযরত মাওলানা বর্ণনা করিয়াছেন যে, মদীনা শরীফে অবস্থানকালে আমার প্রতি এই কাজের নির্দেশ হয়। বলা হয় যে, 'আমি তোমার দ্বারা এই কাজ করাইব।' এই নির্দেশ পাওয়ার পর কিছুদিন আমি অস্থিরতার মধ্যে কাটাই। আমার ন্যায় একজন দুর্বল লোকের দ্বারা এই বিরাট কাজ কি করিয়া নেওয়া হইবে ইহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। কোন একজন আরেফের নিকট এই কথা উল্লেখ করিলে তিনি সান্ত্বনা দিলেন। বলিলেন, "তোমাকে তো বলা হইয়াছে যে, তোমার দ্বারা আমি কাজ নিব, এইরূপ তো বলা হয় নাই যে–তুমি এই কাজ করিবে। সুতরাং তোমার ভাববার কি আছে? যিনি কাজ নিতে চাহিয়াছেন তিনিই আনুসঙ্গিক সবকিছুর ব্যবস্থাও করিবেন।" আরেফের এই কথা শুনিয়া হযরত মাওলানার অন্তরে শান্তি ফিরিয়া আসিল। শান্ত চিত্তে তিনি মদীনা শরীফ হইতে দেশের পথে রওয়ানা হইলেন। দীর্ঘ পাঁচ মাস হারামাইন শরীফে অবস্থানের পর হিজরী ৪৫ সনের তেরই রবিউস-সানী তারিখে কান্দালায় ফিরিয়া আসিলেন।

হজ্ব হইতে ফিরিয়া আসিয়াই হযরত মাওলানা তবলীগী গাশত' শুরু করিলেন। অন্যদিগকেও উৎসাহ দিতে শুরু করিলেন, যেন তাঁহারা সাধারণ মানুষের মধ্যে গিয়া ইসলামের মূলনীতি– কলেমা, নামাজ তওহীদ ইত্যাদির শিক্ষা প্রচার শুরু করেন। এই দাওয়াত লোকের কানে নতুন ঠেকিল। দ্বীন প্রচারের জন্য সাধারণ মানুষের পক্ষে মুখখোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ বলিয়া অনুভূত হইল। তবুও কিছু সংখ্যক লোক অত্যন্ত লজ্জা-সংকোচের সঙ্গে এই কাজ শুরু করিলেন।

একবার নূহ নামক স্থানে অনুষ্ঠিত এক জনসমাবেশে হযরত মাওলানা লোকজনকে এই কাজে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানাইলেন। তিনি ছোট ছোট

দলে বিভক্ত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের মূলনীতিগুলি প্রচার করার কথা বলিলেন। তাঁহার অনুসারীগণ প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য একমাসের সময় চাহিলেন। একমাসের মধ্যেই জামাত তৈরী হইয়া গেল। এই জামাত আট দিনে পূর্বনির্ধারিত কয়েকটি গ্রাম ঘুরিয়া আসিল। ফয়সালা হইল, পরবর্তী এক সপ্তাহ কাজ করিয়া এই জামাত গোরাগাঁও জেলার মোহ্নী নামক স্থানে জুমার নামাজ আদায় করিবে এবং জুমা বাদ সেখানে বসিয়াই পরবর্তী কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইবে।

পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক এই জামাত মোহ্নীতে আসিয়া জুমার নামাজ আদায় করিল। হযরত মাওলানাও এখানে আসিয়াই জামাতের সহিত শামিল হইলেন। এখানে বসিয়াই পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণ করা হইল। জামাত পরবর্তী সপ্তাহেও যথারীতি কাজ করিয়া দ্বিতীয় জুমা তাওরু নামক স্থানে আদায় করিল। তৃতীয় জুমা ফিরুজপুর তহসীলের নাগিনা নামক স্থানে পড়া হইল। হযরত মাওলানা যথারীতি প্রত্যেকটি জুমায় আসিয়া শামিল হইলেন এবং পরবর্তী কর্মসূচী তৈরী করিয়া দিলেন। বেশ কিছুকাল এই কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া মেওয়াত এলাকায় কাজ চলিতে থাকিল। এই সমস্ত জামাতের প্রত্যেকটি সম্মেলনে বিশিষ্ট আলেমগণকে ডাকিয়া আনিয়া ওয়াজ-নসিহতের ব্যবস্থা হইল। দীর্ঘ কয়েক বৎসর তবলীগের প্রাথমিক কাজ-কর্ম এইভাবেই অগ্রসর হইতে থাকিল।

তৃতীয় হজ্ব

হিজরী ১৩৫১ সনে হযরত মাওলানা তৃতীয় বারের মত হজ্ব করিতে গেলেন। নিজামুদ্দিনে রমজানের চাঁদ দেখিয়া রওয়ানা হইলেন। জামাতের সঙ্গে দিল্লী ষ্টেশনে তারাবীর নামাজ আদায় করিলেন। তারাবীহ্ শেষ করিয়াই করাচীগামী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। মাওলানা এহ্‌তেশামুল-হাসান সাহেব এই সফরেও হযরতের সঙ্গী হইয়াছিলেন। তিনি শায়খুল-হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেবকে লিখিত একপত্রে হযরত মাওলানার কর্মব্যস্ততার বিবরণ দিতে যাইয়া লিখিয়াছিলেন ঃ "হযরতজী অধিকাংশ সময় হেরেম শরীফে কাটাইতেছেন। তবলীগী জলসা এবং চর্চা সবসময়ই চলিতেছে। সব জায়গাতেই হযরত এই প্রসঙ্গে কিছু না কিছু অবশ্যই বলিয়া থাকেন।"

মক্কা শরীফ হইতে রওয়ানা হইয়া হযরত মাওলানা ৫২ সালের ৬ই মোহররম মোতাবেক ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে এপ্রিল তারিখে মদীনা শরীফ পৌছান। এখানে জিয়ারত সমাপ্ত করিয়া ৫২ হিজরীর ৬ই জমাদিউল আওয়াল তারিখে দেশে ফিরিয়া

আসেন।

হজ্বের এই সফর হইতে হযরত মাওলানা তাঁহার কর্মপন্থা সম্পর্কে আরও দৃঢ় প্রত্যয় এবং সুদূর প্রসারী সম্ভাবনার আশাবাদ নিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে হজ্ব হইতে ফিরিয়া আসিয়া কাজের গতি অনেকগুণ বাড়িয়া গেল।

দেশে ফিরিয়াই হযরত মাওলানা বিরাট এক জামাতসহ মেওয়াত এলাকায় পরপর দুইটি সফর করিলেন। এই সফরে সব সময় শতাধিক লোক তাঁহার সঙ্গে থাকিত। স্থানে স্থানে বড় বড় জনসমাবেশও হইয়া যাইত। দীর্ঘ একমাস ব্যাপীয়া প্রথম সফর চলিল। দ্বিতীয় সফরেও প্রায় একমাসের কাছাকাছি সময় লাগাইলেন। সফরের সময় সঙ্গী-সাথীগণকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া গ্রামে গ্রামে গাশ্‌ত করিবার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। এইভাবে কাজ আরও কিছুটা অগ্রসর হইল।

দ্বীনি মারকাজের দিকে

দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হযরত মাওলানা অনুধাবন করিলেন যে, ঘর-সংসার এবং জমি-জিরাতের পরিবেশে থাকিয়া মেওয়াতের গরীব কৃষক শ্রেণীর লোকদের পক্ষে দ্বীনের তালীম গ্রহণ করার মত সময় বাহির করা সম্ভব নয়। অথচ গভীর মনোযোগ এবং পূর্ণ একাগ্রতা ব্যতীত দ্বীনি আচার-আচরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এই সমস্ত লোকের পক্ষে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে দোয়া-কলেমা এবং ইবাদত-বন্দেগীর নিয়ম-কানুন রপ্ত করারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। সমস্ত লোককে এই বয়সে গৃহস্থালী কাজ-কর্ম হইতে পৃথক করিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করার কথাও চিন্তা করা যাইত না। মাঝে-মধ্যে ওয়াজ-নসিহত শ্রবণ করিয়া লোকজন আমল-আকীদার সব বিষয়ে ওয়াকেবহাল এবং অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, এইরূপ আশা করাও ছিল সম্পুর্ণ অবাস্তব। অথচ মাওলানার লক্ষ্য ছিল, এই সমস্ত অধঃপতিত মানুষগুলিকে জাহেলী জিন্দেগীর গভীর অন্ধকার হইতে দ্রুত টানিয়া তুলিয়া ইসলামী জিন্দেগীর সঙ্গে পরিচয় ঘটানো। এই বিপ্লবী পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন বিপ্লবী কর্মপন্থার। সেই বিপ্লবী কর্মপন্থা কি হইবে, সেই বিষয়েই তিনি গভীর ভাবনা-চিন্তা শুরু করিলেন। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, পরিপূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত লোককে ছোট ছোট জামাতের আকারে ঘর-সংসারের পরিবেশ হইতে অল্প কিছুদিনের জন্য বাহির করিয়া দেশের বিখ্যাত ধর্মীয় কেন্দ্রগুলির দিকে নিয়া যাইতে হইবে। তাহাদিগকে সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দ্বীনি তালীম প্রদান করিতে হইবে। তারপর এই

সমস্ত লোকের দ্বারাই জনসাধারণের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়াইতে হইবে। এর দ্বারা একই সঙ্গে প্রত্যেকটি শিক্ষা করার কথা তাহারা বলিতে থাকিলে খুব সহজে প্রতিটি কথা তাহাদের অন্তরের গভীরে যাইয়া প্রবেশ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত লোক দ্বীনি মারকাজগুলিতে আলেম-বুজুর্গদের মজলিসে নিয়মিত উঠা-বসা করিয়া, তাঁহাদের কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের উঠা-বসা, চলাফেরা এবং অন্যান্য কাজ-কর্ম দেখিয়া দ্বীনি জিন্দেগীর প্রাত্যহিক নকশা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিবারও সুযোগ পাইবে। শিশুরা যেমন বড়দের দেখাদেখি আদব-কায়দা শিক্ষা করে, তাঁহাদের কথাবার্তার অনুকরণ করিয়া কথাবার্তা শিখে, তেমনি প্রকৃতিদত্ত পন্থায় দ্বীন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী এই লোকগুলির মধ্যে অতি সহজ উপায়ে দ্বীনের তালীম গ্রহণ এবং দ্বীনি জিন্দেগীর নকশা মশ্‌ক করার সুযোগ লাভ ঘটিবে।

ঘর-সংসারের পরিবেশ হইতে দূরে জীবনের এই দুর্লভ অবসর সময়টুকুতে কোরআন শরীফের কিছু কিছু অংশ শুদ্ধ করিয়া পড়া, মাসআলা-মাসায়েল এবং ফাজায়েল ও সাহাবায়ে-কেরামের জীবন সম্পর্কে কিছু কিছু জ্ঞান আহরণ করার মধ্যেও সময় অতিবাহিত করার ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যেকটি জামাতকে এক একটি চলন্ত মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করিতে পারিলে আশাতিরিক্ত ফললাভের সুযোগ উপস্থিত হইতে পারে। এইভাবে কিছুকাল কাটাইয়া যখন ইহারা ঘরে ফিরিবে, তখন দ্বীন সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞানভাণ্ডার নিঃসন্দেহে অনেকগুণ সমৃদ্ধ হইয়া যাইবে। হযরত মাওলানার এই পরিকল্পনা ছিল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বাস্তবমুখী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উহা রূপান্তরিত করা ছিল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন। কোন তরিকতের পীর তাঁহার মুরীদগণের উপর সার্বিকভাবে এতটুকু মেহনতের কাজ অর্পণ করিলেও বোধহয় তাহা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বিবেচিত হইত। কেননা, সাংসারিক কাজকর্ম ছাড়িয়া স্ত্রী-পুত্র হইতে পৃথক হইয়া আসিয়া নিছক কোন দ্বীনি কাজে সময় দেওয়া সাধারণ সংসারী মানুষের পক্ষে কতটুকু কঠিন তপস্যা তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তদুপরি এই সমস্ত লোককে যেসব এলাকায় পাঠানো হইবে, সেখানকার লোকজন তাহাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবে–মূর্খ অমার্জিত এই সমস্ত লোকের প্রতি কঠোর আচরণ বা বিদ্রূপাত্মক ব্যবহার করিবে, না সহানুভূতি প্রকাশ করিবে তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

হযরত মাওলানার ধারণা অনুযায়ী যুক্তপ্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলস্থ মুজাফফর নগর ও সাহারানপুর এলাকা ছিল তদানীন্তনকালে এলেমচর্চার প্রাণকেন্দ্র এবং আলেম-বুজুর্গগণের প্রধান মারকাজ। সুতরাং আলেম-উলামাগণের নিকট-সাহচর্য অর্জন করা

এই এলাকায় যেরূপ সহজলভ্য ছিল, অন্য কোন এলাকায় তেমনটি ছিল না।

হযরত মাওলানার মতে দ্বীনি জীবনের প্রাণশক্তিতে ব্যাপক নির্জীবতা নামিয়া আসার সর্বপ্রধান কারণ ছিল দ্বীনের ব্যাপারে ভাল অনুভূতি এবং গভীর মহব্বতের অভাব। এই রোগের সঠিক চিকিৎসা হিসাবে তিনি স্থির করিলেন, দ্বীনি শিক্ষা এবং আত্মশুদ্ধির পন্থা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ও দ্বীনকে সর্বাবস্থায় দুনিয়ার উপর স্থান দেওয়ার মত মনোভঙ্গী সৃষ্টি করার মহান লক্ষ্য সম্মুখে লইয়া মেওয়াতের লোকদের ইউপির এই সমস্ত এলাকায় নিয়া আসা। যেন তাহারা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া এবং উলামাদের সাহচর্যে থাকিয়া অনেক কিছু শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। এ সম্পর্কে হযরত মাওলানা এক পত্রে জনৈক মেওয়াতী সাগরেদকে লিখিয়াছিলেনঃ

"আমার ধারণায় মূর্খতা, অলসতা এবং সত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিস্পৃহতাই সকল ফেতনার চাবিকাঠি। যতদিন মানুষের মনের উপর এই সমস্ত অশুভ এবং ঘৃণ্য প্রবণতার প্রাধান্য থাকিবে, ততদিন দেখিতে পাইবে, একের পর এক করিয়া শুধু ফেতনাই সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে তোমাদের পক্ষে নিরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর থাকিবে না। বর্তমানে যে সমস্ত ফেতনা মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে এইগুলির গতিরোধ এবং ভবিষ্যতের সকল ফেতনার সম্ভাবনা হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই তোমাদের এলাকায় যে কাজ চালু করা হইয়াছে, উত্তমরূপে তার অনুশীলন এবং ইউপির বিভিন্ন এলাকায় জামাতবদ্ধভাবে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত অন্য কোন পথ দেখি না।"

হযরত মাওলানার আশা ছিল, এই পদ্ধতিতে জামাতের যে সব কাজ-কর্ম হইবে তৎপ্রতি অত্র এলাকার উলামা-বুজুর্গগণের পৃষ্ঠপোষকতালাভ সহজ হইবে। অপর পক্ষে মেওয়াতের পশ্চাদপদ ধর্মীয় আচার-আচরণ হইতে বহু দূরে অবস্থিত গরীব জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রাণালী যে কতটুকু শোচনীয় এবং ইসলামী আদব-কায়দা হইতে কত দূরে, সেই সম্পর্কেও এই এলাকার আলেম বুজুর্গগণের একটা স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হওয়া সহজতর হইবে।

এইভাবে হয়ত বা তাঁহাদের অন্তরে এই এলাকার প্রতি কিছুটা সহানুভূতিরও উদয় হইতে পারে। হযরত মাওলানার ধারণায় এই সমস্ত বুজুর্গানে-দ্বীনের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত এই কাজের পূর্ণ সাফল্য লাভ ছিল সুদূরপরাহত।

এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়াই হযরত মাওলানা মেওয়াত হইতে বাহির হইয়া প্রথম জামাত কান্দালায় প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। কেননা, কান্দালা ছিল তদান্নীন্তন যুগের একটা বিশিষ্ট এলমী মারকাজ এবং তাঁহার নিজের শহর। সেখানে তাঁহার প্রেরিত লোকজনদের আদর-যত্ন এবং সহানুভূতি লাভ করার আশা ছিল সুনিশ্চিত।

রমজান মাসে মাওলানা নির্দেশ দিলেন, কান্দালা যাওয়ার জন্য কিছু লোককে প্রস্তুত কর। মাওলানা তো বলিয়া দিলেন, কিন্তু কান্দালার ন্যায় আলেম-বুজুর্গগণের কেন্দ্রভূমিতে মেওয়াতের অশিক্ষিত-অমার্জিত কৃষক সম্প্রদায়ের লোকজনদের পক্ষে তবলীগ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া ছিল রীতিমত দুঃসাহসের ব্যাপার। যাহারা এই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা শুনিলেন, তাঁহাদের মনেও ধাক্কা লাগিল। কেননা, আসলে কাজটা কি, কি উদ্দেশ্যে এই সমস্ত লোককে পাঠানো হইতেছে, অন্য লোকের মধ্যে তাবলীগ করার জন্য না নিজেদের শিক্ষা ও আত্মশুদ্ধির পথ তালাশ করার মানসে সেই বিষয়টি তখনও পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে লোকজনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই। ফলে পীর-মুর্শিদের দেশ কান্দালায় 'তবলীগ' করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার কথা শুনিয়া অনেকেই সংকুচিত হইয়া উঠিলেন। হাজী আব্দুর রহমান সাহেবের ন্যায় একান্ত অনুরক্তজনও বলিয়া দিলেন যে- "কান্দালা আমার ওস্তাদ-মুর্শিদ হযরত মাওলানা মুহম্মদ সাহেবের শহর। আমি সেখানে তবলীগ করিতে যাওয়ার ধৃষ্টতা দেখাইতে পারি না।"

কিন্তু মাওলানা কোন কাজের কথা একবার উত্থাপন করিলে তাহা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেন না। জীবনে তিনি কোন কাজকেই ছোট করিয়া দেখেন নাই। ভাবনা-চিন্তার পর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইত, তাহা বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করিতেন। এই জন্যই কোন একটা কাজের কথা একবার তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়া গেলে কোন অনুসারীর পক্ষেই তাহা উপেক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত দশজনের একটি জামাতে রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। রমজানের পর ঈদের জামাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাফেজ মকবুল হাসান সাহেবের নেতৃত্বে জামাত দিল্লী হইতে রওয়ানা হইয়া গেল। এই জামাতে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের সকলেই ছিলেন বাছা বাছা লোক, প্রায় সকলেই এতেক্বাফ করিয়া আসিয়াছিলেন। তবু তাহাদিগকে বিশেষভাবে তাকিদ করিয়া দেওয়া হইল- যেন জামাতের সকলেই সর্বক্ষণ আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকেন। জামাত কান্দালায় পৌঁছার পর বিশেষ সমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করা হইল। হযরত মাওলানার নিজের বাড়ীতেই তাঁহাদের থাকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় জামাত

প্রথম জামাত কান্দালার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়া দেওয়ার পর দ্বিতীয় আর একটি জামাত সাহারানপুর জেলার রায়পুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার সিদ্ধান্ত হইল। হযরত মাওলানা নিজেই দশ-এগার জনের এক জামাতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

হযরত শাহ্ আব্দুর রহীম রায়পুরীর (রাহঃ) স্থলাভিষিক্ত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরীর সহিত মাওলানার পূর্ব হইতেই গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। ফলে সেখানেও কোন অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার কারণ ছিল না।

সঙ্গীগণের মধ্যে নম্বরদার মেহরাব খান নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন, রাতের বেলায় তাঁহার জন্য দোওয়া করা হইল। সকাল নাগাদ তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং এই অবস্থাতেই রওয়ানা হইলেন। ক্বারী দাউদ সাহেবের একটি ছেলের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল। ক্বারী সাহেব প্রিয় সন্তানের গোর-কাফন করিয়া আর বাড়ীতে ফিরিলেন না, কবরস্থান হইতেই সোজা রওয়ানা হইয়া গেলেন।

পরিকল্পিত সফরের ব্যবস্থা ঃ

সুপরিকল্পিতভাবে মেওয়াত এলাকার প্রত্যেকটি জনপদে ব্যাপকভাবে জামাত প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে হযরত মাওলানা মেওয়াতের প্রত্যেকটি তহসীলের নিখুঁত নকশা তৈরী করাইলেন। গোরগাঁও জেলার প্রতিটি গ্রামে যাতায়াত করার রাস্তাঘাট, লোকবসতির বিবরণ ইত্যাদি দ্রুত সম্পন্ন করাইয়া নিলেন। বিশেষভাবে নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেক মোবাল্লেগ যেন স্ব-স্ব কাজ-কর্মের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই বিবরণে প্রত্যেক গ্রামের লোকসংখ্যা, অবস্থান, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামের দূরত্ব, আশপাশের জনপদসহ প্রত্যেকটি বস্তির নম্বরদারের নাম এবং অন্যান্য যে সমস্ত ধর্মাবলম্বী লোক রহিয়াছে, তাহাদের আনুপাতিক জনসংখ্যাও যেন বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়।

নক্‌শা ও মানচিত্র তৈরী হওয়ার পর ফিরুজপুর তহসীলের অন্তর্গত চিতুরা নামক স্থানে একটি মাহফিল হইতে ষোলটি জামাত তৈরী করা হইল। প্রত্যেক জামাতে একজন করিয়া আমীর এবং প্রতি চার জামাতের উপরে একজন প্রধান আমীর নিযুক্ত করা হইল। এই জামাতগুলির দ্বারা সমগ্র মেওয়াত ভূমির প্রত্যেকটি জনপদে অন্ততঃ একটি 'গাশত্' করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল। ব্যবস্থা হইল, চারিটি জামাত পার্বত্য এলাকাগুলি সফর করিবে, অন্য চারিটি

জামাত প্রধান রাজপথ এবং পার্বত্য এলাকার মধ্যবর্তী গ্রামগুলিতে, হুডল হইতে দিল্লীগামী সড়ক এবং আলওয়ার হইতে দিল্লীগামী সড়কের মধ্যবর্তী এলাকাটিতে অন্য চারিটি জামাত এবং অবশিষ্ট চারিটি জামাত হুডল-দিল্লী সড়ক ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী এলাকা সফর করিয়া আসিবে। এই সমস্ত জামাত স্থানে স্থানে কিছু সময়ের জন্য থামিবে, লোকজন একত্রিত করিবে এবং নিজামুদ্দিন হইতে এক এক ব্যক্তি আসিয়া জামাতের খবরাখবর সংগ্রহ এবং ওয়াজ-নসিহত করিয়া যাইবেন। এইভাবে কাজ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত সবগুলি জামাত আসিয়া ফরিদাবাদ নামক স্থানে সমবেত হইল। স্থানীয়ভাবে একটি এজতেমার ব্যবস্থা হইল, হযরত মাওলানা এই সমাবেশে যোগদান করিলেন। সিদ্ধান্ত হইল, ষোলটি জামাত চারিভাগে বিভক্ত হইয়া এখান হইতে দিল্লী যাইয়া জামে মসজিদে সমবেত হইবে। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী সবগুলি জামাত একত্রিত হইয়া দিল্লী জামে মসজিদে এজতেমা করা হইল। এই এজতেমা হইতেই পুনরায় জামাত পানিপথ, শুনীপথ এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি এলাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া পড়িল।

এই দিকে মেওয়াত এলাকাতেও তবলিগী গাশত্ এবং দ্বীনশিক্ষার এই অভিযানে দলের পর দল বাড়ীঘর হইতে বাহির হইয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে সফর এবং ওয়াজ-এজতেমা ব্যাপকভাবে চলিতে থাকিল। মাওলানা তখন এই একই দাওয়াত সর্বত্র সবার কাছে দিয়া চলিলেন। বিভিন্ন স্থানে মাওলানা নিজে সফর ও সভা-সমাবেশে যোগদান করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকটি মাহফিলেই বিভিন্নভাবে একই ব্যাপারে তিনি ব্যাপক উৎসাহ দিতে থকিলেন। এই মহান কাজে শরীক হইলে পর দ্বীন-দুনিয়ার কি সব ফায়দা হাসিল হইতে পারে, তা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় সর্বত্র প্রচার করিয়া যাইতে লাগিলেন।

মাওলানার এহেন নিরলস মেহনতের ফলে মেওয়াতের বিভিন্ন এলাকায় এবং বাহিরে সফর করার জন্য ব্যাপকভাবে জামাত তৈরী হইতে লাগিল। মাওলানা বিশেষভাবে জোর দিলেন, যেন দেশের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির ন্যায় জামাতবদ্ধভাবে দ্বীন শিক্ষা করার এই অভিযানও জনগণের মধ্যে একটি সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়। এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই স্থানে স্থানে অনেকগুলি এজতেমার আয়োজন করা হইল। প্রত্যেকটি মাহ্‌ফিল হইতেই স্থানীয়ভাবে এবং ইউপির বিভিন্ন এলাকায় গাশ্‌ত করার জন্য জামাত তৈরী হইতে থাকিল। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই কাজে সময় দেওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে সাড়া দিতে আরম্ভ করিল। সামাজিক কাজকর্মের জন্য স্বেচ্ছায় অর্থ দানের প্রচলন তো পূর্ব হইতেই ছিল, মেওয়াতের লোকেরাই বোধহয় সর্বপ্রথম দ্বীনি কাজের জন্য সময় দানের

প্রচলন করিল।

দ্বীনের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিবার জন্য যে সমস্ত লোক উদ্বুদ্ধ হইতে ছিলেন মাওলানা তাহাদের এই প্রেরণার মধ্যে বৃহত্তর কোরবানী ও ত্যাগের জযবা সৃষ্টি করিতে এবং আল্লাহ্‌র পথে খেত-খামার এবং কাজ কারবারে স্বেচ্ছায় ক্ষতি স্বীকার করার অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে যত্নবান হইলেন। সুদীর্ঘকাল পরে উপেক্ষিত এই মেওয়াত ভূমিতেই দ্বীনের খাতিরে দুনিয়ার স্বার্থ ত্যাগ এবং ক্ষতির ঝুঁকি স্বেচ্ছায় বরণ করার সৎসাহস প্রদর্শনের রেওয়াজ নূতন করিয়া সৃষ্টি হইল। অবশ্য স্বেচ্ছায় ক্ষতি বরণ করার সৎসাহস নিয়া যাঁহারা আল্লাহ্‌র পথে বাহির হইয়া যাইতেন তাঁহাদিগকে খেত-খামার বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, এমন কথা কোথাও শুনা যাইত না। বরং যাঁহারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া চলিয়া যাইতেন, ফিরিয়া আসার পর তাঁহারা সুস্পষ্টভাবেই অনুভব করিতেন যে, তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে খেত-খামার এবং দোকান-পাটে ক্ষতি তো দূরের কথা বরং উন্নতি হইয়াছে। কোন এক অদৃশ্য শক্তির সহায়তায় যেন সককিছু আরও অধিকতর সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়াছে।

বৈপ্লবিক সাফল্য

হযরত মাওলানার সীমাহীন ত্যাগ ও সাধনায় দ্বীনের কাজে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ যে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীটি প্রয়োজনীয় ছামানাদি কাঁদে বহন করিয়া নিজ খরচে আল্লাহ্‌র পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের বিরামহীন অভিযানের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যুগ-যুগের অন্ধকারে নিমজ্জিত মেওয়াত ভূমির দ্বীনি জীবনে এমন এক নীরব বিপ্লব হইয়া গেল– যাহার নজির দূর অতীতের ইতিহাসেও খুব কমই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। যে অঞ্চলের জনগণ অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের জমাট অন্ধকারে যুগ যুগ ডুবিয়াছিল, তাহাদেরই প্রচেষ্টায় বিস্তীর্ণ মেওয়াত ভূমির প্রতিটি গ্রামে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে দ্বীনদারীর অভূতপূর্ব সাড়া পড়িয়া গেল। ব্যাপক গণজীবনে এই অচিন্তপূর্ব চারিত্রিক বিপ্লব সৃষ্টি করার পেছনে যদি বিরাট কোন রাষ্ট্রশক্তি তাহার সকল সামর্থ নিয়োজিত করিয়া মোটা বেতনের হাজার হাজার কর্মী ও প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগাইত, তবুও এই বিপ্লব সাধন যে সম্ভব হইত না, এই কথা জোর করিয়াই বলা চলে। কেননা, মানুষের অন্তরের জগতে যে বিপ্লব সাধিত হয় তাহা সম্পদ বা শক্তি প্রয়োগের দ্বারা কখনও সম্ভব হয় নাই। হৃদয়ের আগুন দিয়াই বৃহত্তর গণমানুষের অন্তরে মহত্তর কোন প্রেরণার উত্তাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

ইসলামের প্রথম যুগে যে তরিকায় দ্বীনের কাজ হইয়াছে, সেই তরিকায়ই হইতেছে সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ কর্মপন্থা। ইসলামের সিপাহীগণ তখন হাতিয়ার ও রসদপত্র নিজ নিজ বাড়ী হইতে লইয়া বাহির হইতেন এবং নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং শাহাদতের আকাঙক্ষায় উদ্বেলিত অন্তর নিয়া জেহাদে শরীক হইতেন। অনুরূপভাবে মোবাল্লেগ এবং প্রচারকগণও আল্লাহর হুকুম পালন করা ফরজ মনে করিয়াই স্ব-স্ব কর্তব্য নিতান্ত আগ্রহ সহকারে সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়া যাইতেন। মেওয়াতের এই দ্বীনি তাহ্‌রীকের মধ্যেও প্রাথমিক যুগের সেই নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগের প্রত্যক্ষ নমুনা ভাসিয়া উঠিতে দেখা গেল। কাঁধে সামান্য বিছানাপত্র, বগলে কায়দা-ছিপারা এবং দুই-একটি দ্বীনি পুস্তক, চাদরের এক কোণে কয়েকটি শুকনা রুটি বা কিছু ভাজা বুট, যবানে আল্লাহর জিকির, চোখে-মুখে রাত্রি জাগরণের আলামত, কপালে ছেজদার নিশানী, হাত-পায়ে কঠোর শ্রমের চিহ্ন– এই নমুনার লোকজনের কাফেলা আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে এবং এক বস্তি হইতে অন্য বস্তির দিকে যখন অগ্রসর হইতে থাকে তখন যে কোন সচেতন মুমিনের মানসচক্ষে কি খোদ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরিত বীরে-মাউনার সেই শহীদ সাহাবীগণের অগ্রসরমান কাফেলাটির আপছা একটু নমুনা ভাসিয়া উঠে না?

মেওয়াতের পরিবেশে পরিবর্তনের ঢেউ ঃ

ধীরে ধীরে মেওয়াতের পরিবেশ এবং জনগণের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন শুরু হইল। স্থানে স্থানে এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ নমুনাও প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেখানকার সমাজ-জীবনে এমন এক অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া উঠিল যে, দ্বীনি ভাবধারা লালনের ক্ষেত্রে তা আশাতিরিক্ত উপযোগিতা লাভ করিয়া ফেলিল। ধর্মীয় জীবনের এক একটি সমস্যা নিয়া পৃথক পৃথকভাবে মেহনত করার আর প্রয়োজন অবশিষ্ট রহিল না। যদিও তখনও পর্যন্ত শেষ মঞ্জিল ছিল বহুদূরে, তবুও যে সমস্ত এলাকায় কাজ ঠিকমত চালু হইয়াছিল, সেই সমস্ত এলাকার লোকজনকে শুধু এতটুকু বুঝাইয়া দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, এইটুকু দ্বীনি কাজ বা এতটুকু তোমাদের দায়িত্ব। দেখা যাইত, এতটুকুতেই লোকেরা অতি সহজে তা কবুল করিয়া নিত।

হযরত মাওলানার মতে, কাজের সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা ছিল প্রথমে লোকজনের মধ্যে প্রকৃত ঈমান, দ্বীনি শিক্ষা করার আন্তরিক আগ্রহ এবং আখেরাতের মুক্তির উদ্দেশ্যে অকাতরে জান-মালের ক্ষতি স্বীকার করিয়া নেওয়ার মত উন্নত চারিত্রিক যোগ্যতা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া। তাঁহার ধারণা ছিল, এতটুকু

হইয়া যাওয়ার পর পরিপূর্ণ দ্বীন বাস্তবায়িত হওয়ার কাজ আপনা হইতেই পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে।

এই ধারায় কাজ করার পর মেওয়াতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দ্বীনদারীর এমন এক-একটি উন্নত নমুনা প্রকাশমান হইতে শুরু করিল, যেগুলির যে কোন একটির জন্য অন্য পথে বছরের পর বছর সংগ্রাম করিলেও হয়ত তাহা বাস্তবায়িত হওয়া সহজ হইত না। বরং স্থান বিশেষে উল্টা জিদ এবং হঠকারিতাই হয়ত আরও তীব্রতর হইয়া উঠিত। তবলীগের কাজ ব্যাপকতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে দ্বীনের প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহার বাস্তব রূপও প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিল। যে এলাকায় মাইলের পর মাইলের মধ্যে কোথাও মসজিদ নজরে পড়িত না, সেইখানে গ্রামে গ্রামে মসজিদ গড়িয়া উঠিতে শুরু করিল এবং দেখিতে দেখিতে হাজার হাজার মসজিদ নির্মিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শতশত মক্তব এবং দ্বীনি মাদরাসাও কায়েম হইল।

মেওয়াতের দ্বীনি মাদরাসাগুলির মধ্যে নূহ নামক স্থানে অবস্থিত মাদরাসা মঈনুল-উলুমই সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিষ্ঠান। হিজরী ১৩৫০ সনে হযরত মাওলানা ইলয়াসের (রাহঃ) পবিত্র হাতে এই মাদরাসার বুনিয়াদ রাখা হয়। দিল্লীর বিখ্যাত ব্যবসায়ী মাওলানার একজন বিশিষ্ট ভক্ত খানবাহাদুর মৌলবী আজিজুদ্দিন সাহেব এই মাদরাসার নির্মাণ কাজে সর্বাপেক্ষা বেশি উৎসাহ প্রদান করেন। মঈনুল-উলুম ছাড়াও দেশের অন্যান্য কেন্দ্রীয় স্থানগুলিতে আরও অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ এই সমস্ত মাদরাসা হইতেই শত শত মেওয়াতী তরুণ হাফেজ ও আলেম হইয়া বাহির হইতেছেন। হিন্দুয়ানী লেবাস-পোশাক, পুরুষের কানের মাকড়ী, হাতের বালা ইত্যাদি আপনা হইতেই খসিয়া গিয়া তদস্থলে ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলন আসিয়া গেল, লোকজন ব্যাপকভাবে দাড়ি রাখিতে শুরু করিলেন। বিবাহ-শাদী হইতে শরিয়তবিরোধী রছম-রেওয়াজ আপনা হইতেই উঠিয়া গেল। সুদ-শরাবও প্রায় নিশ্চিহ্ন হইল। লুটপাট, হত্যাকাণ্ড এবং দাঙ্গা-ফসাদ আগের তুলনায় অনেকগুণ কমিয়া গেল। অপরপক্ষে বে-দ্বীনি শেরক-বেদাত এবং অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কার দিন দিন যথেষ্ট দুর্বল হইয়া পড়িল।

পরিবেশ ও পরিস্থিতির এই দ্রুত পরিবর্তন সম্পর্কে একজন বৃদ্ধ মেওয়াতীর সহজ-সরল বর্ণনা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সময়েই একদিন ক্বারী দাউদ সাহেব মেওয়াত হইতে আগত একজন বৃদ্ধ কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, বর্তমানে তোমাদের এলাকার খবর কি? বৃদ্ধ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাষায়

জবাব দিলেন ঃ

> আমি তো বেশি কিছু জানি না, তবে এইটুকু বলিতে পারিব যে, যে সমস্ত বিষয়ের জন্য আগে অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন কাজ হইত না, সেইসব এখন এমনিতেই হইয়া যাইতেছে। অপরপক্ষে যে সমস্ত বিষয় বন্ধ করার জন্য বহু লড়াই-ঝগড়া করিয়াও কোন ফল হয় নাই, সেইসব এখন আপনাআপনিই বন্ধ হইয়া যাইতেছে। কোন প্রকার সাধ্য-সাধনার আর প্রয়োজন হইতেছে না।

মাওলানার ধারণায় এত অল্প সময়ে এমন বিরাট পরিবর্তন ঘটিবার পিছনে যে কারণটি সর্বাপেক্ষা বেশি কার্যকরি ছিল, তাহা হইতেছে এই এলাকার কিছু লোকের সাময়িকভাবে ঘর-সংসারের আকর্ষণ ছাড়িয়া ইউপির এল্মী মারকাজগুলিতে গিয়া সমবেত হওয়া। ফিরুজপুরের মিয়া মুহম্মদ ইসাকে লিখিত এক পত্রে তিনি এই অভিমতই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ

> ইউপি এলাকায় জামাতের সফর এমন এক তাসীরের সৃষ্টি করিয়াছে যে, মাত্র দুইশত লোকের সামান্য কিছু সময় ব্যয় করার ফলেই মেওয়াত এলাকায় এমন পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব হইয়াছে। যে জন্য আজ লোকের মুখ হইতে "বিরাট বিপ্লব" শব্দটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাহির হইয়া পড়িতেছে। তোমাদের এলাকার মূর্খ অমার্জিত লোকদের সকল ঘৃণ্য প্রবণতাসমূহ আজ আল্লাহর দ্বীন প্রচারের ন্যায় অত্যন্ত পবিত্র প্রেরণায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।"

অন্যদিকে এই কাজের মাধ্যমেই মাওলানার অন্তরে সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়া গিয়াছিল যে, মেওয়াতের লোকেরা যদি দ্বীনের অন্বেষণে ঘর ছাড়িয়া বাহির হওয়ার অভ্যাসকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করিয়া না নেয় এবং দ্বীনের প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে সাধ্য-সাধনা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে, তবে তাহারা আগের চাইতে আরও অনেক বেশি অধঃপতনের সম্মুখীন হইবে। কেননা, এই ধর্মীয় নবজাগরণের ফলে মেওয়াতের ব্যাপারে চারিদিকেই একটা ব্যাপক উৎসুক সৃষ্টি হইয়াছে। সকলের অবাক দৃষ্টি এখন যুগযুগের অজানা অন্ধকারে নিমজ্জিত মেওয়াতবাসীদের প্রতি নিবন্ধ হইয়াছে। এই সমস্ত প্রত্যেকটি উৎসুক দৃষ্টির সঙ্গে এক একটি নতুন ফেত্নার বীজ লুক্কায়িত থাকা মোটেও বিচিত্র নয়। অজ্ঞতা ও অজানার যে প্রাচীর মধ্যে এতদিন তাহারা লুকায়িত ছিল, এখন সেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাই এখন মেওয়াতবাসীদের পক্ষে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। এক পত্রে মাওলানা উল্লেখ করেন ঃ

> যে পর্যন্ত তোমরা তবলীগের কাজের জন্য চার চার মাস দেশ হইতে দেশান্তরে সফর করার অভ্যাসকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করার মত মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে না পার, সেই পর্যন্ত তোমাদের এই জাতি দ্বীনদারীর স্বাদ এবং প্রকৃত ঈমানের মজা হইতে চির বঞ্চিত হইয়া থাকিবে। এখন পর্যন্ত যতটুকু কাজ হইয়াছে তাহা নিতান্তই সাময়িক। যদি চেষ্টা ছাড়িয়া দাও তবে এই জাতি আগের চাইতেও অনেক বেশি নিচে নামিয়া যাইবে। কেননা, এখন পর্যন্ত ইহারা অজানা ও মূর্খতার প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। ব্যাপক মূর্খতার কারণেই হয়ত অন্যান্য জাতি ইহাদিগকে গণনার মধ্যেই আনিত না। এখন যদি তাহারা মজবুত দ্বীনের দুর্গ সৃষ্টি করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা না করে, তবে নিজেদের অলক্ষ্যেই অন্যদের সহজ শিকারে পরিণত হইয়া যাইবে।"

দিল্লীর মোবাল্লেগগণ

দিল্লী এবং আশপাশের এলাকায় তবলীগের কাজ করিবার জন্য কিছুকাল পাঁচজন বেতনভোগী লোক নিয়োজিত ছিলেন। ইহারাও তবলীগের প্রচলিত নিয়ম অনুসারেই কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। ইহারা প্রায় আড়াই বৎসর কাজ করিলেন। কিন্তু ইহাদের দ্বারা হযরত মাওলানার উদ্দেশ্য পূরণ হইতেছিল না। ফলে এই প্রাণহীন ঢিলাঢালা কাজের প্রতি মাওলানা বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িলেন। মেওয়াতের স্বেচ্ছাসেবী মোবাল্লেগগণের দ্বারা যে জীবন-স্পন্দন সৃষ্টি হইয়াছিল, এই সমস্ত লোকের দ্বারা তেমন কিছুই হইয়া উঠিল না। শেষ পর্যন্ত কাজের এই পদ্ধতির প্রতি মাওলানা সম্পূর্ণরূপে ভীতশ্রদ্ধ হইয়া এই নিয়ম বন্ধ করিয়া দিলেন।

শেষ হজ্ব এবং হারামাইনের দাওয়াতের কাজ

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত মাওলানার আন্তরিক আকাংখা ছিল, হিন্দুস্থানে তবলীগের কাজ পূর্ণমাত্রায় চালু হইয়া গেলে কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট

মোবাল্লেগসহ হারামাইন শরীফে গিয়া ইসলামের কেন্দ্রভূমি হইতে সারা দুনিয়ায় এই কাজের ধারা ছড়াইয়া দেওয়া। ইসলাম হারামাইন হইতেই যাত্রা শুরু করিয়াছিল, এই উত্তরাধিকার সেখানকার লোকদের হাতে পুনরায় তুলিয়া দিতে পারিলে আবার দুনিয়াব্যাপী প্রথম যুগের প্রাণশক্তি সহকারে ইসলামের দাওয়াত ছড়াইয়া পড়িবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। দিনে দিনে আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হইয়া উঠায় হিজরী ১৩৫৬ সনের ১৮ই যিলক্বদ তারিখে হযরত মাওলানা বাছাবাছা সঙ্গীগণের একটি জামাতসহ হারামাইনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। সফরে মাওলানা এহতেশামুল হাসান সাহেব, সাহেবজাদা মাওলানা মুহম্মদ ইউসুফ সাহেব, মাওলানা এনামুল হাসান, মাওলানা মুহম্মদ, হাজী আব্দুর রহমান, মাওলানা জহিরুল হাসান এবং মাষ্টার মাহমুদুল হাসান সাহেবানকে সঙ্গে লইলেন। মেওয়াতের তবলিগী কাজ এং মক্তবসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব মাওলানা রেযা হাসান সাহেবের উপর ন্যাস্ত হইল। দিল্লীর কাজ দেখাশোনার দায়িত্ব পড়িল হাফেজ মাওলানা মকবুল হাসান সাহেবের উপর। তবলিগী কাজের অধীন মাদরাসাগুলির দায়দায়িত্ব পালন, নতুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং সভাসমিতিতে যোগদান করার জিম্মা দিলেন হাজী রশীদ আহম্মদ সাহেবের উপর। সবার উপরে শায়খুল-হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেবকে সার্বিক কাজের দেখা-শোনার ভার দিলেন।

যাত্রাপথে জাহাজের মধ্যে হজ্বের মাসআলা-মাসায়েল আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তবলীগেরও ব্যাপক চর্চা হইতে থাকিল। জেদ্দা হইতে মক্কাশরীফ যাওয়ার পথে হজর নামক স্থানের লোকজনকে একত্রিত করিয়া হযরত মাওলানা তাঁহাদের সম্মুখে ভাষণ দিলেন। হাজেরানের সকলেই এই ভাষণ আগ্রহ সহকারে শুনিলেন, তারিফ করিলেন। হজ্বের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছিল, মক্কা শরীফের অবস্থান এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করার সমস্যা ছিল, তাই এখানে দাওয়াতের কাজ করার মত সময় হইল না। মিনায় অবস্থানের সময় দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকার হাজীগণের সহিত তবলীগ সম্পর্কে মত-বিনিময় হইল। এখানে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশের ব্যবস্থা করিয়া হযরত মাওলানা তাঁর দাওয়াত পেশ করিলেন। বক্তৃতায় উপস্থিত লোকজনের মধ্যে বেশ প্রভাব পড়িল।

হজ্ব শেষ হইয়া যাওয়ার পর হিন্দুস্থানের কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় লোকের সহিত দাওয়াতের কাজ শুরু করা সম্পর্কে পরামর্শ হইল। তখনকার হেজাজভূমির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া প্রত্যেকেই এই ব্যাপারে এখানে মুখ না খোলার পরামর্শ দিলেন। অতঃপর মক্কায় বসবাসরত বিশিষ্ট হিন্দী আলেম, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজের মক্কীর (রাহঃ) খলিফা

হযরত মাওলানা শফীউদ্দীন সাহেবের খেদমতে হাজির হইয়া পরামর্শ চাহিলেন। তিনি হযরত মাওলানার প্রস্তাব অত্যন্ত জোর দিয়া সমর্থন করিলেন এবং বলিলেন, এই কাজ শুরু করিলে আল্লাহর তরফ হইতে সাহায্য আসিবে বলিয়া আমি মনে করি।

এক জুমার দিনে মুহম্মদ সাঈদ বাসালামা মক্কী নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে দাওয়াত হইল। খাওয়া-দাওয়ার পর হযরত মাওলানা দাওয়াত ও তবলীগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। মাওলানার আন্তরিক দরদ মিশ্রিত কণ্ঠের এই সংক্ষিপ্ত ভাষণেই সেই ভদ্রলোক বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। আগ্রহ সহকারেই তিনি কতিপয় মুল্যবান পরামর্শ দিলেন।

বাহরাইন হইতে আগত হাজীদের এক জামাতের সঙ্গে মতবিনিময় হইল। এই জামাতে দুইজন বিশিষ্ট আলেমও শরীক ছিলেন। হযরত মাওলানার তকরির শুনিয়া ইহারা অঙ্গীকার করিলেন যে, দেশে ফিরিয়া এই কাজের জন্য তাঁহারা সর্বশক্তি নিয়োগ করিবেন।

হেজাজে বসবাসকারী নেতৃস্থানীয় হিন্দুস্থানী ব্যবসায়ীগণের সঙ্গে কথা হইল। প্রথম প্রথম অবশ্য তাঁহারা হযরত মাওলানার কথাবার্তা শুনিয়া কিছুটা হতচকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বারের সাক্ষাতে অনেকে আকৃষ্ট হইলেন। ইহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ দিলেন যে, হারামাইনে কাজ শুরু করার পূর্বে বাদশার অনুমতি লাভ করা প্রয়োজন। সেইমতে, তবলীগের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আরবী ভাষায় একটি দরখাস্ত তৈরী করিয়া তা বাদশার সম্মুখে পেশ করার সিদ্ধান্ত হইল। মাওলানা এহতেশামুল-হাসান সাহেব পৃথকভাবে শায়খুল ইসলাম আব্দুল্লাহ বিন হাসান এবং শায়খ-বিন্-বালহীত এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

দুই সপ্তাহ পরে ১৯৩৮ খৃঃ ১৪ই মার্চ তারিখে হযরত মাওলানা, হাজী আব্দুল্লাহ দেহলভী, শায়খ আব্দুর রহমান মাজহার এবং মাওলানা এহতেশামুল-হাসানসহ বাদশার দরবারে আমন্ত্রিত হইলেন। বাদশাহ তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন। নিজে মসনদ হইতে উঠিয়া আসিয়া মেহমানগণের সঙ্গে মোসাফাহা করিলেন ও সম্মানের সঙ্গে দরবারে নিয়া বসাইলেন। তবলীগ সম্পর্কিত দরখাস্তটি বাদশাহর দরাবরে পেশ করা হইল। বাদশাহ মনোযোগ সহকারে তা পাঠ করিয়া প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত তওহীদ, কোরআন-সুন্নাহ এবং শরিয়তের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মতবিনিময় করিলেন। অতঃপর অত্যন্ত ইজ্জতের সঙ্গে সম্মানিত মেহমানগণকে বিদায় দিলেন।

মাওলানা এহতেশামুল হাসান সাহেব তবলীগের কর্মপদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য ও

লক্ষ্য সম্পর্কিত দরখাস্তটির আর একটি সংক্ষিপ্ত কপি শায়খুল ইসলাম এবং প্রধান কাজী শায়খ আব্দুল্লাহ্ বিন হাসানের নিকট পেশ করিলেন। হযরত মাওলানা নিজেও মাওলানা এহ্তেশামুল হাসানসহ তাঁহার সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। শায়খুল ইসলাম অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তবলীগের কার্যধারা সম্পর্কে বিস্তারিত মতবিনিময়ের পর তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এইকাজ সমর্থন করিলেন। তবে আনুষ্ঠানিক অনুমতি দানের ব্যাপারটি তদানীন্তন মক্কা-মদীনার আমীর যুবরাজ ফয়সলের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থগিত রাখিলেন।

মক্কা শরীফে অবস্থানের সময় সকাল-সন্ধ্যা জামাত বাহির হইয়া বিভিন্ন এলাকায় গাশ্ত করিতে থাকিত। অনেক লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিয়াও তবলীগের দাওয়াত পেশ করা হইল। কয়েকটি সমাবেশেরও আয়োজন করা হইল। এই সমস্ত জমায়েতে মাওলানা ইদ্রিস এবং মাওলানা নূর মুহম্মদ সাহেবান তকরির করিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই দাওয়াতের কাজে শরীক হওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন।

উলামা এবং বিশিষ্ট চিন্তাশীল লোকদের এক জমায়েতে হযরত মাওলানা প্রশ্ন উঠাইলেন– মুসলমানদের বর্তমান অবনতির কারণ কি? অনেকেই নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিলেন। সর্বশেষে হযরত মাওলানা বক্তব্য রাখিলেন। জাতিকে অধঃপতনের অতল গহ্বর হইতে টানিয়া তোলার ব্যাপারে দাওয়াত ও তবলীগের ভূমিকার কথা বিশদভাবে পেশ করিলেন। উপস্থিত সকলে এই বক্তব্যে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইলেন।

এক বুজুর্গের আগমন

সাহেবজাদা হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদিন আমরা সকলে বাবুল-উমরার সম্মুখস্থ আমাদের বাসস্থানে বসিয়াছিলাম, হযরতজী আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কিছু কথাবার্তা বলিতেছিলেন। এমন সময় দরজার সম্মুখে সম্পূর্ণ অপরিচিত একব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিতে লাগিলেন– তোমরা যে কাজ করিতেছ, মনোযোগ সহকারে তাহা করিয়া যাও। এই কাজের পুরস্কার ও প্রতিফল এত বিরাট যে, যদি তোমাদিগকে তা বলিয়া দেওয়া হয় তবে বরদাশ্ত করিতে পারিবে না। এতটুকু বলিয়াই লোকটি চলিয়া গেলেন। হযরতজী তাঁহার কথাবার্তা বলিয়া যাইতেছিলেন। সেই লোকের কথায় তিনি মোটেও মনোযোগ দিলেন না। আমরা বুঝিয়াই উঠিতে পারিলাম না, এই আগন্তুক কে ছিলেন।

হিজরী ১৩৫৭ সনের ২৫শে সফর তারিখে মক্কা শরীফ হইতে রওয়ানা হইয়া ২৭শে সফরের সকাল বেলায় তাঁহারা মদীনা শরীফ পৌছিলেন। মদীনায় অবস্থানের সময়ও বরাবর তবলীগের কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল। ব্যাপকভাবে কাজ করার জন্য মদীনার আমীরের অনুমতির প্রয়োজন ছিল, অনুমতি চাহিয়া দরখাস্তও পেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু জানা গেল, মদীনার আমীরের পক্ষে এই ধরনের কোন অনুমতি প্রদানের এখতেয়ার নাই–তিনি কাগজপত্র মক্কা শরীফে পাঠাইয়া দিতেছেন। সেখান হইতে যে নির্দেশ আসিবে, সেইরূপই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। এই খবর পাওয়ার পর হযরতজী মাওলানা এহ্তেশামুল হাসান এবং মাওলানা সৈয়দ মাহমুদসহ আমিরে-মদীনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যের কথা বিশদভাবে ব্যক্ত করিলেন, আমির হযরত মাওলানার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইলেন।

বিভিন্ন লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও তবলীগ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হইতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে হযরত মাওলানা দুইবার কোবা পল্লীতে গমন করেন। এখানে আয়োজিত এক সমাবেশে তকরির করিবার পর বেশ কিছুসংখ্যক লোক কাজে যোগ দেওয়ার জন্য সম্মত হয়।

একই মকসুদ সামনে রাখিয়া দুইবার উহুদ এলাকাও সফর করা হয়। সেখানকার এক সমাবেশে মাওলানা ইউসুফ এবং মাওলানা নূর মুহম্মদ সাহেবান প্রাঞ্জল আরবি ভাষায় হৃদয়গ্রাহী বয়ান রাখেন। লোকেরা এই বয়ানেও অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়।

পথে-ঘাটে বেদুঈনদের সঙ্গে কথা হইত, বালকদের ডাকিয়া কলেমা-দোয়া জিজ্ঞাসা করা হইত, কাজের অগ্রগতিতে কখনও কিছুটা আশার সঞ্চার হইত আবার কখনও নিরাশা নামিয়া আসিত। তবে এই সফরের মাধ্যমে এইকথা ভালভাবেই উপলব্ধি হইল যে, হিন্দুস্থানের তুলনায় আরব দেশে তবলীগের কাজ ব্যাপকভাবে চালু করার প্রয়োজন অনেক বেশি।

দেশে প্রত্যাবর্তন

হেজাজে অবস্থানের সময়ও হযরতজী মেওয়াত এবং দিল্লীর কর্মধারা সম্পর্কে বে-খবর ছিলেন না। কাজের বিবরণসহ সব সময়ই পত্র যাইত এবং তিনি সবগুলি পত্রের জবাবে প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং উৎসাহ দিতেন।

মদীনা শরীফে পনের দিন অবস্থানের পর সঙ্গীগণের পরামর্শক্রমে দেশে ফিরিয়া আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল। দেশে ফিরিয়া আসার পর মক্কা শরীফের জনৈক ভক্তের একটি পত্রের জবাবে তিনি যে সব কথা লিখিয়াছিলেন, তার মধ্যে

এই সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। পত্রটির মর্মছিল এইরূপ ঃ

মোহ্তারম, ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

দেশে ফিরিয়া আসার কারণ হইল, মদীনা শরীফে পনের দিন অবস্থানের পর এক সকালে আমি একটি সুষ্ঠু ভিত্তির উপর হেজাজভূমিতে তবলীগের কাজ শুরু করিবার ব্যাপারে বিশেষ জোর দিলাম। সঙ্গীগণের প্রত্যেকেরই দৃঢ়ভিত্তির উপর কাজ শুরু করিবার জন্য অন্ততঃ দুই বৎসরকাল হেজাজে অবস্থান করা জরুরী বলিয়া মত দিলেন। আমার ধারণাতেও তাঁহাদের এই মত ছিল নির্ভুল– বাস্তব ভিত্তিক। কিন্তু এত দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার ফলে হিন্দুস্থানে কাজ যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনার কথাও সকলে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। এই পরিস্থিতির আলোকেই হিন্দুস্থানের কাজকে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ফিরিয়া আসিয়াছি, যেন ইহার পর স্থায়িভাবে সেখানে অবস্থান করিয়া মজবুতির সঙ্গে কাজ শুরু করিবার পথে আর কোন বাধা না থাকে।

আপনাদের অন্তরে যদি দ্বীনে-মুহাম্মদীর প্রতি সত্যিকার দরদ থাকিয়া থাকে এবং এই দ্বীনের অস্তিত্ব ও অগ্রগতির প্রতি কোন আগ্রহ সৃষ্টি হয়, নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং মাল-দওলতের চাইতে দ্বীনে-মুহাম্মদীর অস্তিত্বের গুরুত্ব বেশি বলিয়া মনে হয়, সর্বোপরি আমার দেখানো তরিকা কার্যকরী এবং সহী বলিয়া ধারণা হয়, তবে আমার কর্মধারা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং সেখানকার জামাতকে এই কর্মনীতি অনুসরণ করার প্রতি আগ্রহী করিয়া এই কাজের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতঃ স্ব-স্ব ঈমান মজবুত করিতে অগ্রসর হউন। ইতি–

বান্দা মুহম্মদ ইলয়াস,
নিজামুদ্দিন-দিল্লী।

পঞ্চম অধ্যায়

মেওয়াত এলাকার বাহিরে তবলীগ অভিযান

হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিয়া হযরত মাওলানা মেওয়াত এলাকায় তবলিগী কাজের গতি আরও ব্যাপকতর করিয়া তুলিলেন। ব্যাপকভাবে সফর-সমাবেশ এবং গাশ্ত শুরু হইল। নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত জামাত বাহির হইয়া আসিয়া ইউপির বিভিন্ন শহর ও গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। গ্রামের আওতা ছাড়াইয়া শহরবাসীদের মধ্যেও দাওয়াতের কাজ শুরু হইল। মেওয়াতের ন্যায় দিল্লীতেও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মোবাল্লেগগণের সমাবেশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিভিন্ন মহল্লায় জামাত তৈরী করিয়া সাপ্তাহিক গাশ্তেরও সূচনা হইল।

শহর জীবনের হাল-অবস্থা দেখিয়া হযরত মাওলানার অনুভূতিশীল অন্তরে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল, তাহা দিন দিন তীব্রতর হইয়া তাঁহাকে একেবারে বেকারার করিয়া তুলিল। গভীর অন্তরদৃষ্টির মাধ্যমে তিনি অনুভব করিলেন ঃ

(এক) শহরগুলির মধ্যে অবশ্য তখনও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় দ্বীনদারীর নমুনা কিছুটা বেশি ছিল, কিন্তু ক্রমেই তাহা সংকুচিত হইয়া আসিতেছিল। প্রথম প্রথম দ্বীনদারী সাধারণ মানুষের মধ্য হইতে সংকুচিত হইয়া মুসলমানদের একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে আসিয়া আশ্রয় করিয়াছিল। তারপর গণ্ডী ছোট হইতে হইতে সাধারণ মানুষের মধ্য হইতে সম্পূর্ণ ছুটিয়া আসিয়া একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে শুধু দ্বীনি চাল-চলন অবশিষ্ট রহিল। এক এক এলাকায় বিশিষ্ট দুই-একটি ঘর বা হাতে গোণা দুই-চারিজন লোক ছাড়া দ্বীনদারীর নমুনা বড় একটা নজরে পড়িত না। মাঝে মাঝে হয়তো কোথাও কিছুসংখ্যক ধার্মিক লোককে একত্রিত হইতে দেখিয়া অনেকেই এইরূপ আত্ম-প্রসাদলাভ করিতেন যে, এই যুগেও মাশাআল্লাহ একসঙ্গে এতগুলি মোত্তাকী-পরহেজগার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে গোণা-বাছা কিছু লোকের মধ্যে দ্বীনি জীবন-যাপন করার প্রাণান্তকর প্রয়াস চলিতেছিল, ইহাদের অবর্তমানে সেইটুকুও অবশিষ্ট থকিবে কি-না, সেই সম্পর্কে প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির মনেই রীতিমত সংশয় উপস্থিত হইয়া গিয়াছিল।

হযরত মাওলানা দিব্যদৃষ্টিতে পরিমাপ করিলেন, সমাজের দ্বীনি জিন্দেগীতে পতনের ঢেউ দিন দিনই দ্রুত হইতে দ্রুততর গতিতে আসিয়া প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া চলিয়াছে। যে সমস্ত খানদান বা এলাকা হইতে পুরুষানুক্রমে দ্বীনদারী এবং দ্বীনি-এলেমের রওশনী ছড়াইত দিনে দিনে সেইগুলি দীপ্তিহীন হইয়া

পড়িতেছিল। ইতিমধ্যে যাহারা চলিয়া যাইতেছিলেন তাঁহাদের শূন্য আসন আর পূরণ হইতে ছিল না। মোজাফফর নগর ও সাহরানপুর জেলার এবং খোদ দিল্লীর ঐতিহ্যবান দ্বীনি এলাকাগুলিতে দিনে দিনে যে অধঃপতনের ঢেউ লাগিয়া ছিল, হযরত মাওলানা নিজের চোখেই সেই দৃশ্য দেখিতে ছিলেন। অত্যন্ত উদ্বেগাকুল অন্তর লইয়া তিনি এইসব প্রত্যক্ষ করিতে ছিলেন এবং ভাবিতে ছিলেন, এই অবস্থা চলিতে থাকিলে জাতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? জনৈক বিশিষ্ট আলেমের তিরোধানে তিনি শোকবার্তা প্রেরণের উদ্দেশ্যে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি ছত্রে মাওলানার সেই উদ্বেগ এইভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে ঃ

"আক্ষেপের বিষয় হইল, প্রকৃত আগ্রহ সহকারে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়ার মত মানুষ তৈরী হইতেছে না। যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও দিনে দিনে চলিয়া যাইতেছেন, কিন্তু পিছনে কোন যোগ্য উত্তরাধিকারী তাঁহারা ছাড়িয়া যাইতেছেন না। যে সব লোকের সংস্পর্শে আসিয়া প্রকৃত মানুষ পয়দা হইত, তাঁহারা দ্রুত সরিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের সমতুল্য কোন মানুষ পয়দা হইতেছে না।"

মিল্লাতের এই মহাক্ষতির প্রতিকার করার জন্য হযরত মাওলানার পরিকল্পনা ছিল, মুসলমান জনগণের মধ্যে দ্বীনদারীর অনুভূতি ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া দিয়া এইসব লোকের মধ্য হইতেই এলেম, তাকওয়া এবং সল্‌ফে সালেহীনের নমুনাবিশিষ্ট লোকদের একটি শ্রেণী সৃষ্টি করা। তাঁহার ধারণায় পূর্ববর্তীগণ এইভাবেই কাজ করিয়াছেন, বর্তমানেও এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

দ্বীনি এলেমের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে তো দূরের কথা, অনেক এল্‌মী ঘরানা এবং বিশিষ্ট আলেম পরিবারেও যোগ্য লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। একজন গত হইলে তাঁহার পরিবারের মধ্যে সেই উত্তরাধিকার রক্ষা করার মত মানুষ আর অবশিষ্ট থাকিত না। এই পরিস্থিতিতে দিনে দিনে উম্মতের মধ্য হইতে এলমে-দ্বীনের সহীহ চর্চা একেবারে লুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। এহেন সংকটের মোকাবেলা করিবার ব্যাপারেও হযরত মাওলানা সেই একই পথ অনুসরণের পক্ষপাতি ছিলেন। যে সব বিষয় সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান না থাকিলে একজন লোক পরিপূর্ণ ঈমানদার হইয়া বাঁচিতে পারে না, সেই পরিমাণ এলেম চর্চা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া তাহাদেরই মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক উচ্চজ্ঞান সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করিবার জন্য সকলকে আহবান জানাইলেন।

(দুই) নাগরিক জীবনের জটিল আবর্তে নিমজ্জিত লোকেরা দ্বীনকে অত্যন্ত কঠিন বস্তু হিসাবে গণ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের ধারণা,

দ্বীনদারীর জীবন-যাপন করিবার অর্থ হইতেছে, দুনিয়াদারীর সকল প্রকার আবিলতা হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরিয়া পড়া। সুতরাং, যেহেতু দুনিয়াদারীর কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়া সংসার জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়, তাই দ্বীনদারীর জীবনও একজন সংসারী মানুষের পক্ষে যাপন করা সম্ভবপর নয়। এই চিন্তাধারাকে অভ্রান্ত মনে করিয়াই সাধারণ নগরবাসীগণ দ্বীনদারীর পথ হইতে একেবারেই সরিয়া গিয়া দুনিয়ার জীবনে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছে। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাপার হইতেছে– নিজেদের জীবনধারাকে দ্বীনদারী হইতে বহু দূরে সরাইয়া দিয়াই যেন ইহারা পরিতৃপ্ত। তাহাদের জীবনধারার সকল সম্পর্ক আল্লাহ্‌র দিক হইতে কাটিয়া প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হওয়ার ফলে যে আল্লাহ্‌র রহমত হইতেও দূরে সরিয়া গিয়াছে, সেই অনুভূতিটুকুও তাহাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট থাকিতেছে না। কেননা, হাদীস শরীফে আছে, "নির্ভেজাল দুনিয়া এবং এর অন্তর্ভূক্ত সবকিছু, আল্লাহ্‌র সঙ্গে যেসবের কোন সম্পর্ক নাই, সেই সবই অভিশপ্ত। একমাত্র আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং তৎসম্পর্কিত চর্চাই উপরোক্ত অভিশাপ হইতে মুক্ত।" অবস্থা এমন শোচনীয় পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছে যে, ঐ সমস্ত লোকদিগকে যদি দ্বীনের প্রতি কোন সময় আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয় তবে তাহারা সবিনয়ে এতটুকু পর্যন্ত বলিয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত হয় না যে, হুজুর! আমরা তো দুনিয়ায় কুকুর, উদরের দাস। আমাদের পক্ষে কি এইসব ব্যাপার সাজে?

দ্বীনদারী বনাম দুনিয়াদারী সম্পর্কিত মুসলিম সমাজের এই বহুল প্রচলিত ভুল ধারণাটি দূর করিয়া হযরত মাওলানা মুসলমান সাধারণের মধ্যে দ্বীনের প্রকৃত স্বরূপ তুলিয়া ধরার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করিলেন। তিনি সরলভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, সংসার জীবনের সকল ব্যস্ততা হইত দূরে সরিয়া দাঁড়াইবার নাম দ্বীনদারী নয়; বরং সাংসারিক সকল কাজকর্মকে দ্বীন ও শরিয়তের অধীন করিয়া দেওয়ার নামই হইতেছে প্রকৃত দ্বীনদারী। দ্বীনের সকল বিধি-নিষেধ একান্তভাবে মানিয়া লইয়াও একজন মুসলমানের পক্ষে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সংসারের সকল কাজকর্ম চালাইয়া যাওয়া সম্ভব। দ্বীন তাহার দুনিয়াবী উন্নতির পথে মোটেও কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না। এইরূপ সফল জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার জন্য প্রয়োজন কিছুটা আগ্রহ এবং দ্বীন সম্পর্কিত মোটামুটি স্বচ্ছ কিছুটা জ্ঞানের।

সমাজের সকল স্তরের লোকদের মধ্যে এই সহজ সত্যটুকুর যথার্থ প্রচার না থাকিবার দরুনই দ্বীনদারীর জীবন সম্পর্কিত ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া বৃহত্তর মুসলিম সমাজ দ্বীনের দওলত হইতে মাহরুম হইয়া নিছক দুনিয়া-পুরস্তি এবং

পেটপূজার ঘৃণ্য জীবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। হযরত মাওলানা এই ভ্রান্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই এক পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

"সাধারণ মানুষের চিন্তা-ধারায় দুনিয়াদারী সম্পর্কে ভুল ধারণা প্রচলিত রহিয়াছে। দুনিয়াবী বিভিন্ন উপায়-উপকরণের মধ্যে আত্মনিয়োগ করার নাম কখনও নির্ভেজাল দুনিয়া হইতে পারে না। কেননা, দুনিয়ার প্রতি লা'নত করা হইয়াছে, আর কোন লা'নতি জিনিসের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ পাকের তরফ হইতে নির্দেশ হইতে পারে না। সুতরাং যে সব কাজ করিবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে, সেইসবকে আল্লাহর হুকুম হিসাবে গণ্য করিয়া হুকুমের গুরুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থেই সেইসব কাজের হালাল-হারামের খেয়াল রাখিয়া চলার নাম হইতেছে দ্বীনদারী। অপরদিকে আল্লাহর হুকুমের প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া নিজের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করা এবং জীবন-যাত্রার বিভিন্ন প্রয়োজনসমূহকে আল্লাহর হুকুমের রাস্তায় পূরণ করার চেষ্টা না করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিবার নামই হইতেছে নির্ভেজাল দুনিয়া।"

হযরত মাওলানা দ্বীনকে মানুষের সুখের সেই লালাটুকুর সহিত তুলনা করিতেন, যাহার কিছুটা অংশের সংমিশ্রণ ব্যতীত কোন খাদ্যবস্তুর মধ্যেই স্বাদ সৃষ্টি হয় না, হজমও হয় না। লালার যে অংশটুকুর প্রয়োজন তাহা প্রত্যেক মানু-ষের মধ্যেই মওজুদ থাকে। অনুরূপভাবেই দ্বীনের মৌলিক উপাদানটুকুও প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যেই রহিয়াছে। প্রয়োজন শুধু এইটুকুকে দুনিয়াদারীর সকল কাজকর্মের মধ্যে শামিল করিয়া নেওয়া। এইটুকু করিতে পারিলেই তাহার দুনিয়াদারীর সকল ব্যস্ততা দ্বীনে পরিণত হইয়া যাইবে।

(তিন) দীর্ঘকাল হইতেই এলমে দ্বীন সম্পর্কে এইরূপ একটি ধারণা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, আরবী মাদ্রাসাগুলিতে ভর্তি হইয়া বিশেষ কতকগুলি কিতাব পাঠের মাধ্যমেই শুধুমাত্র উহা আয়ত্ত হইতে পারে। যেহেতু প্রত্যেকটি লোকের পক্ষে মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া অন্ততঃ আট-দশ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করতঃ এই এলেম হাসিল করা সম্ভব নয়, তাই সাধারণের ধারণায় দ্বীনি এলেম তাহাদের ধরা-ছুঁয়ার বস্তু নয়। বিশেষ একটি শ্রেণীই কেবল এই দওলত লাভ করিবার অধিকারী হইবে এবং অবশিষ্ট সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই এলেম শিক্ষা করিবার চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করা অর্থহীন বিড়ম্বনা মাত্র।

দ্বীনি এলেম অবশ্য আরবী মাদ্রাসাগুলিতেই শিক্ষা দেওয়া হয়, আর সেই শিক্ষাই পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা। প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য এলমের এই পরিপূর্ণতা অর্জন সম্ভবও নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে দুনিয়ার কাজকর্মে লিপ্ত থাকিয়াও শিক্ষা করা সম্পূর্ণ সম্ভব। আসহাবে-সুফ্ফার

ক্ষুদ্র একটি অংশ ব্যতীত সাহাবায়ে কেরামের প্রায় প্রত্যেকেই ঘর-সংসারী ছিলেন। তাঁহারা কৃষি, কারিগরি প্রভৃতি জীবিকার সকল স্তরেই ছড়াইয়া ছিলেন। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের ঝনঝাটও তাঁহাদের কম ছিল না। তদুপরি মদীনা শরীফে তখন দ্বীনি শিক্ষার নিয়মিত কোন মাদ্রাসাও ছিল না; থাকিলেও তাঁহাদের সকলের পক্ষে সেই মাদ্রাসার নিয়মিত ছাত্র হইয়া জীবনের আট-দশটি বৎসর ব্যয় করা কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হইত না। কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকেই দ্বীনের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপেই ওয়াকেফহাল ছিলেন। কোন একজন সাহাবীও দ্বীনের জরুরী এলেম হইতে বঞ্চিত ছিলেন না। এই এলেম তাঁহারা কোথা হইতে হাসিল করিয়া ছিলেন? সকলেরই জানা আছে যে, এই এলেম তাঁহাদের মধ্যে আসিয়াছিল রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিসগুলিতে নিয়মিত হাজিরা দিয়া, যাঁরা বেশী জানিতেন তাঁহাদের সঙ্গে উঠাবসা এবং তাঁহাদের চাল-চলন ও জীবনযাত্রা-প্রণালী গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া। সর্বোপরি সফর ও জেহাদ অভিযানে সাধারণ মানুষেরা জ্ঞানীগুণীগণের নিকট-সান্নিধ্যে থাকিয়া এবং উঠা-বসা ও চলা-ফিরার মধ্যেই যখন যাহা দরকার হইত, সেই সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়ার যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চালু হইয়া ছিল, তাহার মাধ্যমেই সকল প্রকার প্রয়োজনীয় এলেম আয়ত্ত করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া ছিল। অবশ্য সেই পরিবেশ এবং সেই হালত পরিপূর্ণরূপে সৃষ্টি করিবার কথা আজকের দিনে কল্পনাও করা যায় না, কিন্তু সেই পরীক্ষিত রাস্তা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে নিঃসন্দেহে আজও সেই অবস্থার বশবর্তী হইয়াই হযরত মাওলানা জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়ানো অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষগুলিকে দ্বীনের জরুরী এলেম হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে কিছুটা সময় বাহির করিবার দাওয়াত পেশ করিলেন। তাহাদিগকে দ্বীনি শিক্ষার খাতিরে মালের জাকাতের ন্যায় কিছুটা সময়েরও জাকাত পেশ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

হযরত মাওলানা গভীরভাবে লক্ষ্য করিলেন যে, এই সমাজে বাস করিয়া একটা লোক দ্বীন সম্পর্কে কিছুটা আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও শরিয়তের প্রাথমিক মাসআলা-মাসায়েলগুলিও ঠিকমত রপ্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বিশ-পঁচিশ বৎসর আগে একটা লোক মূর্খতা ও কুসংস্কারের যে পর্যায়ে ছিল, জীবনের এতগুলি বছর পাড়ি দিয়া আসিয়াও সে ঠিক আগের সেই স্থানটিতেই দাঁড়াইয়া আছে। যে নামাজের সূরা-কেরাত ভুল পাঠ করিয়া আসিতেছে, তাহার পক্ষে দীর্ঘদিন নামাজে অভ্যস্ত থাকার পরও সেই ভুলের সংশোধন হইয়া উঠে নাই। যে ব্যক্তি দোয়ায়ে-কুনুত এবং জানাযার নিয়ত-দোয়া শিখিতে পারে নাই, সে

ক্রমাগত বহু বৎসর নামাজ পড়িয়াও সেই জরুরী বিষয়গুলি ইয়াদ করিতে সমর্থ হয় নাই। শত শত ওয়াজ মাহফিলে যোগ দেওয়া এবং বছরের পর বছর কোন আলেম-উলামার পড়শী হইয়া বসবাস করার পরও সে উপরোক্ত দোয়াগুলি মুখস্থ করিতে পারে নাই। এই সূরত-হাল দেখিয়াই মাওলানার অন্তরে প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, গতানুগতিক জীবনের মধ্যে থাকিয়া কোন কর্মব্যস্ত মানুষের পক্ষে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ এবং তাহা দ্বারা জীবনের গতিধারায় লক্ষণীয় কোন পরিবর্তনের সূচনা কবরিার আশা সুদূর পরাহত। এই গতানুগতিক জীবনের জমাট বাঁধা অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল সাময়িকভাবে এই সমস্ত লোককে স্ব-স্ব পারিপার্শ্বিকতার বেড়াজাল হইতে মুক্ত করিয়া গতিশীল ইসলামী পরিবেশের মধ্যে কিছুদিন নিয়া রাখিয়া দেওয়া– যাতে করিয়া তার অন্তর মধ্যে লুক্কায়িত ইচ্ছাশক্তি নূতনভাবে জাগ্রত হইয়া পরিবেশের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একটু শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইতে পারে। তাহার সৎ ইচ্ছা, দ্বীনের প্রতি সুপ্ত আকর্ষণ এবং মৃতপ্রায় ঈমানের উত্তাপ অনুকূল পরিবেশের মধ্যে নূতন শক্তিতে উজ্জীবিত হইয়া উঠার সুযোগ লাভ হয়, প্রয়োজনমত দ্বীনি এলেম শিক্ষা করিয়া নেওয়ার মওকা ঘটে।

(চার) হযরত মাওলানার চিন্তা-ধারায় মুসলমানী জীবনের আদর্শ হইতেছে– দ্বীনের কাজে প্রত্যেকটি মানুষকেই ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। কোন সঙ্গত কারণে প্রত্যক্ষভাবে কাজে অংশগ্রহণ করায় সাময়িকভাবে অপারগ হইলে তাহাকে অন্ততঃপক্ষে সর্বক্ষণ যাহারা কাজ করিতেছেন তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে হইবে।

শুধুমাত্র রুজী-রোজগার সর্বস্ব নাগরিক জীবনকে হযরত মাওলানা দ্বীনের কাজে সচেষ্ট মোজাহেদী জিন্দেগীর মোকাবেলায় স্থবির জীবন বলিয়া অভিহিত করিতেন। তিনি মনে করিতেন– এইরূপ জীবন ইসলামের সরল পথ হইতে দূরে এবং ভ্রান্ত-বিকৃত জীবন বৈ আর কিছু নয়। শহরবাসীদের জীবন দীর্ঘকাল হইতেই শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য বা রোজী-রোজগার সর্বস্ব নিছক ভোগবিলাসের জীবনে পরিণত হইয়া গিয়াছে। হযরত মাওলানা এই ভোগসর্বস্ব জীবনের মধ্যে দ্বীনি জীবনের আবেগময়তা সৃষ্টি করিবার আকাঙক্ষায় উদ্বেলিত হইয়া শহরবাসীদিগকেও দ্বীনের কাজে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করিবার প্রতি আহবান করিতে শুরু করিলেন।

সমাজের একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী দ্বীনি কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন এবং অবশিষ্ট বৃহত্তর জনসমাজ দ্বীনি পরিবেশ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া দুনিয়াদারীর কাজেই সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া থাকিবে এবং কখনও কখনও দ্বীনি কাজের মধ্যে কিছুটা অর্থ

সাহায্য করিয়া দায়িত্ব শেষ করিয়া ফেলিবে, এইরূপ কর্ম-বন্টন মাওলানা সমর্থন করিতেন না। তিনি বলিতেন, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলির বেলায় যেমন কর্ম বন্টন চলে না, যেমন একজনে শুধু খানা খাইবেন, পানি পান করিবেন না, অন্য জনে শুধু পানি পান করিবেন, খানা খাইবেন না, বা কেহ শুধু খাওয়ার মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করিবে, কাপড় পরিধান করিবে না, অপরজন শুধু পরিধান করিয়াই তৃপ্ত থকিবে খাদ্য গ্রহণ করিবে না– এইরূপ হওয়াটা যেমন সম্ভব নয় বরং সবগুলি কাজই প্রত্যেকটি মানুষের জন্যই সমভাবে জরুরী বলিয়া বিবেচিত হয়; তেমনি, দুনিয়াদারীর প্রত্যেকটি কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে দ্বীনি ফরজগুলি আদায় করা, প্রয়োজনীয় এলমে দ্বীন হাসিল করা এবং দ্বীনি কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা ও আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব পালন করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপরই সমপর্যায়ের দায়িত্ব।

দিল্লীতে মেওয়াতীদের অবস্থান

উপরোক্ত কারণগুলির প্রেক্ষিতেই হযরত মাওলানা শহর এলাকায় দাওয়াতের কাজ ব্যাপকতর করিবার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যেই রূপ দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি শহরবাসীর সম্মুখে দাওয়াত পেশ করিবার কথা চিন্তা করিতে ছিলেন তাহার জন্য শুধু ওয়াজ-নসিহত এবং লেখার মাধ্যমে প্রচার যথেষ্ট হইবে বলিয়া তিনি ভরসা করিয়া উঠিতে পারিতে ছিলেন না। বরং বাস্তব ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ময়দানে কাজ শুরু করা না হইলে শুধু ওয়াজ-নসিহত শেষ পর্যন্ত ক্ষতির কারণ হইতে পারে বলিয়া তিনি আশঙ্কা পোষণ করিতেন। এক পত্রে এই আশঙ্কার কথা উল্লেখ করিতে যাইয়া লিখিয়া ছিলেন ঃ

জনসাধারণের সম্মুখে যে পর্যন্ত বাস্তব নমুনা পেশ করা না যাইবে, সেই পর্যন্ত মানুষকে কাজে উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে ওয়াজ-নসিহত যথেষ্ট হইবে না। ওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে যদি তা বাস্তবে পরিণত করিবার কর্মসূচী না থাকে, তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে হঠকারিতা এবং ধৃষ্টতা প্রদর্শনের প্রবণতা সৃষ্টি হইবে।"

বাস্তব কাজ শুরু করিবার উদ্দেশ্যেই হযরত মাওলানা দিল্লী এবং অন্যান্য কয়েকটি শহর এলাকায় মেওয়াতীদের জামাত পাঠাইতে শুরু করিলেন। এই সমস্ত জামাত দিল্লীতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করিতে শুরু করে। প্রথম প্রথম শিক্ষা-সংস্কৃতির পাদপীঠ দিল্লীতে মেওয়াতী জামাতগুলিকে নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। সাধারণতঃ জামাতকে রাত্রে মসজিদে অবস্থান করিতে দেওয়া হইত না। কোথাও থাকিবার মত জায়গা করিয়া লইতে পারিলেও প্রস্রাব-পায়খানা এবং অন্যান্য প্রয়োজনাদি পুরা করিবার ব্যাপারে খুবই কষ্ট হইত।

শহরের লোকেরা অনেক সময় ইহাদিগকে গালমন্দ করিত। তাহাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করিত। শহরবাসীদের ক্রমাগত দূর্ব্যবহার এবং উপেক্ষায় লাচার হইয়া লোকেরা স্ব-স্ব জামাতের আমীরের নিকট আসিয়া শেকায়েত করিত। বেচারা আমীর কখনও বা মহল্লাবাসীদিগকে অনুরোধ-উপরোধ করিয়া নরম করিতেন আবার কখনও বা জামাতের লোকজনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। এইরূপ জেহাদ-মোজাহাদার ভেতর দিয়াই দীর্ঘ অগ্নিপরীক্ষার এক জামানা অতিবাহিত হইল। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে পরিবেশ পরিবর্তিত হইতে শুরু করিল। শহরবাসীদের ব্যবহারে পরিবর্তন সূচিত হইল। এমনকি দ্বীনের জন্য অসাধারণ জোশ ও কুরবানীর বদৌলতেই শহরবাসীদের নজরে মেওয়াতীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। হযরত মাওলানা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছেন যে, মিয়াজী দাউদ শহরবাসী এবং মেওয়াতীদের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টির কাজে অসাধারণ মেহনত করিতেন। একদিন তিনি দুই তরফের অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ শুনিয়া এমনই লাচার হইয়া পড়িলেন যে, শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্রন্দন করিতে শুরু করিলেন। তাঁহার এই প্রাণফাটা ক্রন্দনের পরই আল্লাহ্ তা'আলা জামাতের জন্য দিল্লীর পরিবেশ সহজ করিয়া দিয়াছেন।"

আহ্লে এলেমগণের প্রতি

হযরত মাওলানার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল যে, যে পর্যন্ত হাক্কানী আলেম সমাজের দৃষ্টি এই কাজের প্রতি আকৃষ্ট না হইবেন এবং যে পর্যন্ত তাঁহারা সর্বতোভাবে দাওয়াত ও তবলীগের এই নাজুক খেদমতের পরিপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রসর না হইবেন, সেই পর্যন্ত কাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাইবে না। এই জন্য তাঁহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, এই কাজের যোগ্য লোকেরাই যেন তাঁহাদের মেধা ও খোদা প্রদত্ত প্রতিভা সহকারে দাওয়াতের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে আগাইয়া আসেন। একমাত্র ইহাদের কুরবানীর দ্বারাই ইসলামের বাগান প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতে পারে, তাঁহাদের মাধ্যমেই কেবল এই পবিত্র বৃক্ষের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা নূতন করিয়া উজ্জীবিত হইয়া উঠা সম্ভব। এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার কারণেই ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে হাক্কানী আলেমগণ দাওয়াত ও তবলীগের যতটুকু কাজ করিতে ছিলেন বা হযরত মাওলানার সহযোগিতা হইতে ছিল, ততটুকুতে তিনি তৃপ্ত থাকিতে পারিতে ছিলেন না। আলেম সমাজের প্রতি তাঁহার দাবী ছিল, প্রথম যুগের বুজুর্গানে দ্বীনের আদর্শে এই যুগের আলেমগণও যেন দ্বীনের দাওয়াতসহ বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মানুষের দ্বারে দ্বারে ছড়াইয়া পড়েন। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা

যাকারিয়া সাহেবকে লিখিত এক পত্রে উল্লেখ করেন–

"দীর্ঘকাল হইতেই আমি এই ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছি যে, যেই পর্যন্ত আমাদের আলেম সমাজ দ্বীনের এশাআতের জন্য সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়া করাঘাত করিতে শুরু না করিবেন এবং মেওয়াতের সাধারণ মানুষের ন্যায় তাঁহারাও গ্রামে-গঞ্জে, শহরে এই কাজের জন্য গাশ্ত করিতে আরম্ভ না করিবেন, সেই পর্যন্ত এই কাজ পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারিবে না। কেননা, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া যদি আলেমগণ কাজ শুরু করেন, তবে তাহা দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রভাব পড়িবে, তাঁহাদের প্রাণ মাতানো বক্তৃতার দ্বারা সেই কাজ হওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গানে-দ্বীনের জীবনকাহিনী হইতেও আমরা এই শিক্ষাই পাইয়া থাকি, যাহা আপনাদের ন্যায় আহলে-এলেমগণ ভালভাবেই অবগত আছেন।"

শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত অনেকের মনেই এইরূপ একটা ধারণা ছিল যে, দাওয়াত ও তবলীগের এই কাজে ছাত্র-শিক্ষকগণ আত্মনিয়োগ করিলে তাঁহাদের শিক্ষাজীবন ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু হযরত মাওলানা যে পদ্ধতিতে আলেম সমাজ এবং মাদ্রাসার তালেবে-এলেমগণের নিকট হইতে কাজ গ্রহণ করিবার কথা চিন্তা করিতেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ছিল শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত উলামা ও তোলাবাগণের জ্ঞানচর্চার পরিধি আরও গভীর এবং ব্যাপকতর করারই একটি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা। এক পত্রে বিষয়টিকে তিনি এইভাবে পেশ করিয়াছেন ঃ

এলমে-দ্বীনের তরক্কী ও প্রসারের অনুপাতে এবং দ্বীনি এলেমের ছায়াতলেই দ্বীনের প্রসার ও তরক্কী হওয়া সম্ভব। আমার এই তাহ্রিকের দ্বারা যদি এলমে-দ্বীনের ক্ষেত্রে সামান্য একটু আঘাতেরও সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, তবে তাহাও আমার পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবলীগের মাধ্যমে এলেম চর্চাকারীগণের কাজে সামান্যতম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং এই কাজের মাধ্যমে এলেমের আরও অধিকতর তরক্কী সাধন করাই আমার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কেননা, বর্তমান অবস্থায় এলেমের ক্ষেত্রে যতটুকু অগ্রগতি দেখা যাইতেছে তাহা নিতান্তই অপ্রতুল।

মাওলানা চাহিতেন, তবলীগের কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করিয়া ছাত্রগণ যেন তাহাদের উস্তাদগণের নেগরানীতেই এলেমের হক আদায় করিয়া এবং লব্ধ এলেমের দ্বারা আল্লাহর বান্দাদের উপকার সাধন করিবার অনুশীলন হাতে-কলমে অভ্যাস করিয়া নেওয়ার সুযোগ পায়। এক পত্রে লিখিয়াছেন-

হায়! শিক্ষার জামানাতেই যদি উস্তাদগণের নেগরানীতে ছাত্রদের মধ্যে

সৎকর্মে উৎসাহ্ প্রদান এবং অন্যায়-অনাচারে বাধাদান করিবার অভ্যাস গড়িয়া উঠিত তবেই হয়ত এলমে-দ্বীন আমাদের জন্য পূর্ণমাত্রায় উপকারে আসিত। আক্ষেপের সঙ্গে বলিতে হয়, ইহা না হওয়াতে অনেক ক্ষেত্রে এলেম বেকার প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। জেহালত এবং জুলমতের কাজ করিতেছে, -ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।"

দ্বীনি কেন্দ্রগুলিতে কাজ করিবার পদ্ধতি

হযরত মাওলানা দেওবন্দ, সাহারানপুর, থানাভবন, রায়পুর প্রভৃতি দ্বীনি কেন্দ্রগুলিতে মেওয়াতীদের জামাত প্রেরণ করিবার সময় কাজ করিবার বিশেষ কয়েকটি পদ্ধতি বলিয়া দিতেন। জামাতকে বিশেষভাবে বলিয়া দিতেন যেন তাহারা বুজুর্গানে-দ্বীনের মজলিসে গিয়া তবলীগের কোন কথা উত্থাপন না করেন। পঞ্চাশ-ষাটজনের এক এক জামাত আশ-পাশের গ্রামগুলিতে ঘুরিয়া সাত-আটদিন পর যেন কেন্দ্রে আসিয়া সমবেত হয়, সেখান হইতে নূতন কর্মসূচী তৈরী করিয়া যেন পুনরায় অন্যান্য গ্রাম এলাকায় সকলে ছড়াইয়া পড়ে। উলামাগণ যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবেই যেন জবাব দেওয়া হয়, নিজেদের তরফ হইতে কোন কথা যেন তাহারা উথাপন না করেন। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেবকে (রঃ) লিখিত এক পত্রে উল্লেখ করেন–

"আমার দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, তবলীগের জামাতগুলি তরিকতের বুজুর্গানের খানকাগুলিতে গিয়া খানকার পরিপূর্ণ আদব রক্ষা করতঃ সেখানকার ফয়েজ-বরকতও গ্রহণ করুক। খানকায় অবস্থানের সময়ের ভিতরেই অবসর সময় আশপাশের গ্রামগুলিতে গিয়া দাওয়াতের কাজেও যেন জারী থাকে। আপনি এই ব্যাপারে আগ্রহী লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কোন একটা নিয়ম ঠিক করিয়া রাখুন। বান্দা নাচীজও কিছু সংখ্যক সঙ্গী-সাথীসহ এই সপ্তাহেই হাজির হইতেছে। তারপর দেওবন্দ এবং থানাভবন পর্যন্ত যাওয়ারও ইচ্ছা আছে।"

বুজুর্গানে–দ্বীনের সমর্থন

জামাতের লোকজনদের বুজুর্গানে-দ্বীনের খেদমতে হাজির হওয়া এবং রুহানী ফয়েজ হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে খানকাগুলির শরণাপন্ন হওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করিবার পর বুজুর্গানে-দ্বীনের অনেকের মনেই শোবা-সন্দেহের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহাও দূর হইয়া গেল।

থানাভবনে জামাত পৌছিয়া আশপাশের এলাকায় ব্যাপক কাজ শুরু করিবার পর হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রহঃ) খেদমতে হাজির হইয়া

বিভিন্ন লোক জামাতের কাজ এবং তাহার ফলে মানুষের মধ্যে ব্যাপক দ্বীনি জাগরণ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিতে শুরু করিল। ইতিপূর্বে হযরত থানভীর মনেও কিছুটা দ্বিধা ছিল। আট-দশ বৎসর মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বাহির হওয়া আলেম উলামাগণের দ্বারা যেখানে তবলীগের কাজ আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইত না, বরং নূতন নূতন ফেতনা সৃষ্টি হইয়া পরিবেশ আরও জটিল করিয়া তুলিতে ছিল, সেইখানে এই সমস্ত মূর্খ মেওয়াতীদের দ্বারা তবলীগের কাজ কি করিয়া সাফল্য লাভ করিবে, এই কথা হযরত থানভী (রহঃ) বুঝিয়া উঠিতে পারিতে ছিলেন না। তাঁহার রীতিমত সন্দেহ ছিল যে, শেষ পর্যন্ত এই তরিকায় তবলীগের কাজ করাতে নূতন কোন ফেতনা সৃষ্টি হইয়া না যায়। কিন্তু মেওয়াতীদের কাজ এবং তাহার বাস্তব ফল দেখিয়া বিশেষতঃ যেই সব এলাকায় মেওয়াতীরা কাজ করিতে ছিল, সেই সমস্ত এলাকার পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করিয়া হযরত থানভীর অন্তরে এই কাজের প্রতি পূর্ণ এতমিনান সৃষ্টি হইয়া গেল। হযরত মাওলানা ইলয়াস (রহঃ) একবার তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া তবলীগের কাজ সম্পর্কে কিছু নিবেদন করিতে শুরু করিলে তিনি বলিলেন– "এই কাজের স্বপক্ষে আর কোন দলিল-প্রমাণ পেশ করিবার প্রয়োজন নাই। দলিল তো পেশ করা হয় কোন বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে। এই কাজের বাস্তব ফল দেখিয়া আমার অন্তরে এতমিনান সৃষ্টি হইয়াছে, এখন এহার জন্য আর কোন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখিতেছি না। আপনি তো মা-শা আল্লাহ নৈরাশ্যকে আশায় রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছেন।"

হযরত থানভীর (রহঃ) আর একটি সন্দেহ ছিল যে, দ্বীনের যথেষ্ট এলেম ব্যতীত এই সমস্ত লোক তবলীগের গুরুদায়িত্ব পালন করিবে কিরূপে? কিন্তু হযরত মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী সাহেব যখন বলিলেন যে, জামাতের লোকেরা যতটুকু বলিবার জন্য তাহাদের উপর নির্দেশ আছে, তাহার বাহিরে কোন কথাই বলে না, নূতন কোন প্রসঙ্গ নিয়া আলোচনাও করে না। তখন হযরত থানভীর (রঃ) সেই সন্দেহও দূরীভূত হয়। তিনি পূর্ণ এতমিনানের সঙ্গে এই দাওয়াতের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

হযরত মাওলানার অতুলনীয় ত্যাগ ও মেহনতের দ্বারা কাজ অগ্রসর হইতে শুরু করিল, এক চেরাগ হইতে হাজার চেরাগ রওশন হইয়া ক্রমেই চারিদিকে আলোর বন্যা ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তদানীন্তন যুগের প্রাতঃস্মরণীয় উলামা-বুজুর্গগণের মনোযোগের দ্বারা ক্রমাগতই এই কাজের ওজন অনেকটা বাড়িয়া গেল। যাহারা প্রথম প্রথম হযরত মাওলানা ইলয়াসকে (রহঃ) মেওয়াতের

কৃষক-মেহনতী মানুষের একজন পীর মনে করিয়া ভাসা ভাসাভাবে তাঁহার কাজের প্রতি মৌখিক সমর্থন দিয়া আসিতে ছিলেন বা তবলীগের এজতেমাগুলিতে যোগদান করিয়া দোয়ায়ে খায়ের করিতেন; তাঁহাদের অন্তরেও এই কাজের সূক্ষ্নতা এবং ইহার সুদূরপ্রসারী ফলশ্রুতি সম্পর্কে উচ্চ ধারণা সৃষ্টি হইতে লাগিল।

কাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হযরত মাওলানার অন্তরে এমন এক আশাবাদ ছিল যে, অনেক সময় তাহা প্রকাশ করিতে যাইয়া আবেগে তাঁহার বাকরুদ্ধ হইয়া যাইত। প্রত্যয় দৃঢ়কণ্ঠে তিনি সকলকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশু সাফল্যে উদ্ভাসিত হওয়ার দাওয়াত দিতেন। তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত মজবুত ধারণা ছিল যে, বর্তমান যুগের সকল দ্বীনি ফেতনার গতিরোধ এবং মুসলমান সমাজকে পতনের সকল পংকিলতা হইতে উদ্ধার করিবার একমাত্র পন্থা হইল দাওয়াত ও তবলীগের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়া। তিনি বিশ্বাস করিতেন, যতদিন পর্যন্ত মুসলমান সাধারণ সরেজমিনে নামিয়া সাহাবায়ে কেরামের আদর্শে দ্বীনের জন্য মেহনতে শামিল না হইবেন, ততদিন পর্যন্ত পতনের গহবর হইতে উদ্ধারলাভ করিবার কোন আশাই তাহাদের পূর্ণ হইতে পারে না। কোন একটি দ্বীনি মাদ্রাসার পরিচালককে লিখিত এক পত্রে হযরত মাওলানার উপরোক্ত প্রত্যয় অত্যন্ত জোরালো ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে।

কাজের অগ্রগতি, সাফল্য এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দাওয়াতের খায়র ও বরকত প্রত্যক্ষ করিয়া হযরত মাওলানা যেমন অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন, তেমনি আবার তাঁহার অন্তরে ভয়ও ছিল-যে, আল্লাহর এই রহমতের পূতধারা হইতে পরিপূর্ণরূপে ফায়দা গ্রহণ করিবার চেষ্টা না হইলে হয়ত বা নেয়ামতের প্রতি এই উপেক্ষার কঠিন প্রতিক্রিয়াও হইতে পারে। জাতি হয়ত আরও অধিকতর গজবেরও সম্মুখীন হইতে পারে। এক পত্রে হযরত মাওলানা এই উদ্বেগই প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তিনি লিখিয়া ছিলেন–

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। কিরূপ আবেগ এবং অস্থিরতার মধ্যে আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি তাহা প্রকাশ করিবার মত ভাষা আমার নাই। প্রিয়বন্ধু! এই কাজ শুরু করিবার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ কিভাবে বর্ষিত হইতেছে, তাঁহার সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য ও সাহায্য কেমন দ্রুত আসিতেছে তাহা দেখিয়া আমার ভয় হয়, আল্লাহ তা'আলার এতবড় অনুগ্রহ-রূপ মেহমানের যদি যথাযোগ্য কদর ও মর্যাদা প্রদান করা না হয় তবে হয়ত মহা ক্ষতি এবং দুর্ভাগ্য নামিয়া আসিতে পারে।

হযরত মাওলানা আবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিতেন, অস্থিরতা বাড়িয়া যাইত,

কিন্তু কখনও কাহারও বিরুদ্ধে কোন শেকায়েত করিতেন না। কাহারও প্রতি কোন অভিযোগ উত্থাপন করা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নীতিবিরুদ্ধ ছিল। কোন সময় যদি কেহ কাজের প্রতি সাধারণ আলেম সমাজের অনীহা বা আগ্রহের অভাব সম্পর্কে কোন শেকায়েত করিতেন, তবে হযরত মাওলানা বিরক্ত হইতেন। বলিতেন, "তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী-কৃষি ইত্যাদি নিছক দুনিয়াদারী ত্যাগ করিয়া এই কাজে আসিতে কতই না ইতঃস্তত করিয়া থাক, আর উলামা-গণ যেইসব কাজ করেন, সেইগুলিও তো দ্বীনের কাজ, তাঁহারা তাঁহাদের সেইকাজ পরিত্যাগ করিয়া এত সহজে চলিয়া আসিবেন, এইরূপ আশা কর কেন?"

অমনোযোগের কারণ

প্রথম প্রথম হযরত মাওলানার কাজের প্রতি সাধারণ মুসলমান, এমন কি আলেম সমাজের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া ছিল না। মেওয়াতের জান-নেসারগণই বিশেষভাবে কাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন। উলামা এবং সাধারণ মুসল-মানের এহেন অনীহারও সঙ্গত কারণ ছিল। দেশে তখন একের পর এক নানা আন্দোলনের ঢেউ চলিতেছিল। খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতা একের পর এক স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ-এর মধ্যে শহরাঞ্চল হইত দূরে মেওয়াতের নিভৃত এলাকায় মাওলানা যে নূতন আন্দোলন শুরু করিয়া ছিলেন, তাহার প্রতি বৃহত্তর জনসাজের দৃষ্টিই পড়িয়াছে অনেক দেরীতে। তাহাছাড়া আন্দোলনের মধ্যে পত্র-পত্রিকা বা প্রচার-পুস্তিকার কোন স্থান ছিল না। একান্ত প্রচারাভিমুখ একটি নীরব বিপ্লবের ন্যায় এই আন্দোলন ধীরে ধীরে অত্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে বাড়িয়া উঠিতে ছিল। প্রাথমিক অবস্থায় আন্দোলন ব্যাখ্যা করিবার ন্যায় যোগ্য আলেম এবং কর্মীরও বড় অভাব ছিল। মাওলানা নিজে ব্যস্ত জীবনযাপন করিতেন। মাটির মানুষের মধ্যে বাস্তব কাজ করাই তিনি বেশি পছন্দ করিতেন। আলাপ-আলোচনার সময়ও তাঁহার ভাষা এতই আবেগময় হইয়া পড়িত যে, প্রথম সাক্ষাতে অনেকের পক্ষেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠা সম্ভবপর হইত না। তাঁহার আলোচ্য বিষয়বস্তুও ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং খুবই উচ্চস্তরের। তাঁহার যবানীতে এই আন্দোলন সম্পর্কিত কথাবার্তা সাধারণ জ্ঞানের লোকেরা প্রথম প্রথম বুঝিত না, কাজের মধ্যে আত্মনিয়োগ করিবার পর সাধারণ লেখা-পড়া না জানা লোকও মাওলানাকে যতটুকু বুঝিতে পারিতেন, দূরে থাকিয়া আনেক জ্ঞানীর পক্ষেও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠা সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। ফলে নিকটে না আসা পর্যন্ত অনেকেই এই আন্দোলন সম্পর্কে কোন গুরুত্বই দিতেন না। পরে বাস্তব

কাজ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন।

মনে হয়, এই মহান আন্দোলনের পক্ষে আল্লাহর তরফ হইতেই এই ব্যবস্থা করা হইয়া ছিল। কেননা, প্রাথমিক অবস্থায় অজানার দেয়ালে আবদ্ধ না থাকিলে হয়ত বা ইহার স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির পথে কোন না কোন অন্তরায় সৃষ্টি হইত। প্রাথমিক অবস্থায় না বুঝিয়া কিছু লোক নানা বিতর্ক জুড়িয়া দিলে কাজ অগ্রসর হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি হইতে পারিত।

হযরত মাওলানার নজীরবিহীন আবেগ এবং লিল্লাহিয়াতের মাধ্যমেই কাজ অগ্রসর হইতে ছিল। যাহাদেরকে তিনি তৈরী করিয়া ছিলেন, তাঁহারা কথার চাইতে কাজ বেশি বুঝিতেন। মাওলানার নিজের হাতেগড়া কয়েকজন নওজোয়ান আলেম ছাড়া এই কাজের মধ্যে আত্মনিয়োজিত অবশিষ্ট সকলেই ছিলেন মেওয়াতের অশিক্ষিত লোক। ইহারা অনেক ক্ষেত্রে হযরত মাওলানার সূক্ষ্ম মজমুন বুঝিতেন না, গভীর জ্ঞানের কথা বুঝিবার মত শিক্ষাও তাহাদের ছিল না; কিন্তু শিক্ষিত এবং শহরবাসী মার্জিত লোকদের চাইতে বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহাদের অনেকগুণ বেশি। তাই দেখা গেল, পনের-বিশ বছরের কঠোর সাধনার মাধ্যমে মাওলানা মেওয়াতের যে ত্যাগী লোকগুলির মধ্যে ঈমান, এক্বীন ও মেহনতের অনুপম জযবা সৃষ্টি করিয়া ছিলেন, সেই লোকগুলিকেই আরও অধিকতর কুরবানীর জন্য বারবার উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এক পত্রে তিনি লিখিয়াছেন ঃ

> "আমি আমার সমস্ত কর্মস্পৃহা এবং শক্তি-সাহস মেওয়াতীদের মধ্যে খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। এখন তোমাদিগকে আরও অধিকতর কুরবানীর জন্য পেশ করা ছাড়া আমার আর কোন পুঁজি অবশিষ্ট নাই। তোমরাই আমার কাজে আরও বেশি করিয়া অগ্রসর হও।"

অন্য এক পত্রে লিখিতেছেন–

> "দুনিয়াবী কাজ কারবারে নিমগ্ন থাকার মত লোকের তো কোন অভাব নাই। দ্বীনের প্রসারের জন্য ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া আসার সৌভাগ্য আজ আল্লাহ্ পাক মেওয়াতীদের ভাগ্যেই লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।"

সাহারানপুরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য

ইউ,পি'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সাহারানপুরের মাজাহেরুল-উলুম মাদ্রাসার প্রতি হযরত মাওলানার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মাজাহেরুল-উলুম ছিল

তাঁহার জীবনের প্রথম কর্মক্ষেত্র। তাছাড়া মাদ্রাসার নাজেম হযরত মাওলানা আব্দুল লতীফ সাহেব শায়খুল হাদীস, হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব এবং অন্যান্য শিক্ষকগণও প্রথম হইতেই তবলীগী কাজে শরিক ছিলেন। মেওয়াতের সভা-সমাবেশে তাহারা সব সময়ই যোগ দিতেন এবং হযরত মাওলানা নিজামুদ্দিনের কাজেও তাঁহাদিগকে অধিকাংশ সময় ডাকিয়া নিতেন। তবলীগের সঙ্গে এই গভীর সম্পর্কের কারণেই সাহারানপুরের প্রতি হযরত মাওলানার একটি নিবিড় আকর্ষণ ছিল। তিনি এই সম্পর্ককে আরও ব্যাপকতর করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। পরিকল্পনা মোতাবেক হযরত মাওলানা নিজে আসিয়া মাজাহেরুল-উলুমের শিক্ষক এবং ছাত্রগণের একটি বড় জামাতসহ সাহারানপুরের পার্শ্ববর্তী ভাট, মির্জাপুর, ছলিমপুর প্রভৃতি কতকগুলি গ্রামে ব্যাপক সফর করিলেন। স্থানে স্থানে জলসা করিয়া দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। এই সফর ও সমাবেশের ফলে সাহারানপুর এলাকায় কাজ অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গেল। আশ পাশের গ্রামগুলিতে লোকের আগ্রহ অনেকগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

কান্দালা ছিল হযরত মাওলানার জন্মভূমি। মাওলানা জন্মভূমির প্রতি তাঁহার কর্তব্য বা হক আদায় করিবার উদ্দেশ্যেই ব্যাপকভাবে কান্দালার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিরাট এক জামাতসহ তবলীগী সফর করিলেন। তাঁহার ধারণায় মা-তৃভূমির জনগণের জন্য দ্বীনের দাওয়াতের চাইতে উত্তম আর কোন সওগাত ছিল না। ১৩৫৬ হিজরীর ১৩ই জমাদিউস্সানি হইতে ২০শে জমাদিউসসানি পর্যন্ত এই সফর চলিল। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা জাকারিয়া সাহেবও এই সফরে শামিল ছিলেন।

হিজরী ৫৯ সনে সিদ্ধান্ত হইল, মেওয়াতের জামাতগুলিকে ব্যাপকভাবে সাহারানপুরে প্রেরণ করিতে হইবে। অন্ততঃ একটি জামাত সবসময়ই যাহাতে সাহারানপুরে অবস্থান করে, তার ব্যবস্থা হইল। দীর্ঘ এক বৎসরব্যাপী এইভাবে একটির পর একটি জামাত সাহারানপুর আসিয়া অবস্থান করিতে থাকিল। মাদ্রাসার ইমারতেই এই সমস্ত জামাতের থাকিবার ব্যবস্থা হইত। এক বৎসর পর হিজরী ৬০ সনের মুহররম মাসে জামাতের অবস্থানের জন্য একটি পৃথক বাড়ী ভাড়া নেওয়া হইল। দীর্ঘ চার বৎসর যাবত এইভাবে বাড়ী ভাড়া করিয়া মেওয়াতের জামাতসমূহের অবস্থান এবং ব্যাপকভাবে আসা-যাওয়া চলিতে থাকিল।

সাহারানপুর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় এলমে-দ্বীনের চর্চা ব্যাপক ছিল। প্রথম প্রথম অশিক্ষিত মেওয়াতীদের জামাত সম্পর্কে সমালোচনা হইত। দ্বীনি শিক্ষায় অপরিপক্ক মেওয়াতের কৃষকশ্রেণীর লোকদের দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্যান্বিত

হইয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন যে, যে সব লোক নিজেরাই বেশি কিছু জানে না, দ্বীনি এলেম এবং আদব-কায়দা শিক্ষা করা যাহাদের নিজেদেরই প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহারা কিভাবে অপর লোককে দ্বীনের দাওয়াত দিবে, তবলীগের দায়িত্ব পালন করিবে? হযরত মাওলানা এই ধরনের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়া পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, অপরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া উহাদের কাজ নয়, ইহাদের মাকসুদ সম্পর্কে যেন কেহ ভুল ধারণা পোষণ না করেন। এক পত্রে তিনি উল্লেখ করেন– "মেওয়াতের এই সমস্ত লোককে যেন কেহ সংস্কারক ভাবিয়া না বসেন। ইহাদের নিকট হইতে আপনারা শুধু শিক্ষা করুন, দ্বীনের খাতিরে, দ্বীনের কথা ছড়াইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে কি করিয়া ঘরবাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইতে হয়। এই একটি মাত্র বিষয় ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ে ইহাদিগকে আপনাদের মুখাপেক্ষী মনে করিবেন, শিক্ষা দিবেন। সাধারণতঃ দেখা যাইতেছে, এইসব শিক্ষার্থীকে সংস্কারক মনে করিয়া উহাদের সম্পর্কে নানা প্রকার এ'তেরাজ করা হইতেছে।"

মাওলানার এই স্পষ্ট ঘোষণার ফলে, যাঁহাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল তাঁহারাও ভুল বুঝিতে পারিলেন। এ'তেরাজ না করিয়া জামাতের প্রতি সাহানুভূতিশীল হইয়া উঠিলেন।

বাহিরের লোকদের আগমন

হিজরী ১৩৫৮-৫৯ সনে দাওয়াত ও তবলীগের এই নূতন আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকটি সাময়িক পত্রিকায় কিছু কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই সামান্য একটু প্রচারের ফলেই আন্দোলনের মূল কেন্দ্রস্থল মেওয়াত এবং দিল্লীর বাহিরে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। যে সমস্ত লোক তবলীগ এবং জাতির এসলাহ্ ও পুনর্জাগরণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে চিন্তা-ভাবনা করিতেছিলেন বা প্রায় একই ধরনের কিছু কিছু কাজ শুরু করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সব বিশিষ্ট দ্বীন-দরদী লোকজন চারিদিক হইতে আসিতে শুরু করিলেন। তাঁহারা হযরত মা-ওলানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, কর্মস্থল মেওয়াতে সফর করিলেন। বহিরাগত এই সমস্ত বিশিষ্ট লোকগণের মধ্যে লাখনৌর প্রখ্যাত দ্বীনি-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাদওয়াতুল-উলামার কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপকও ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং শুভ প্রতিক্রিয়ার ফলে জ্ঞানী-গুণীগণের আরও অনেকেই আকৃষ্ট হইলেন। অনেক সচেতন লোকই প্রথম শুনিয়া অবাক হইলেন যে, এত বড় ব্যাপক একটি তাহ্‌রিক এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে বিস্তীর্ণ এক এলাকার জন জীবনে গভীর শিকড় বিস্তার করা সত্ত্বেও তাঁহারা এই সম্পর্কে কিছুই শুনিলেন না!

হযরত মাওলানা তাঁহার স্বভাবসুলভ বিষয় সহকারে প্রত্যেক নতুন আগন্তুককে প্রাণ খুলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ফলে আলেম-উলামা এবং জ্ঞানী-গুণী সমাজের লোকজন আরও অধিক পরিমাণে কাজের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকিলেন। প্রত্যেক নূতন আগন্তুকের প্রতি হযরত মাওলানা এমন সম্মান প্রদর্শন করিতেন যে, প্রথম সাক্ষাতের পর হইতেই অনেকে কাজে লাগিয়া যাইত, অন্ততঃ কাজের সঙ্গে একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিত।

দিল্লীর কাজ

দিল্লীর কাজ সুসংহত করিবার উদ্দেশ্যে হযরত মাওলানা হাফেজ মুকবুল হাসান সাহেবকে শহরের সবগুলি জামাতের প্রধান পরিচালক আমীর নিযুক্ত করিলেন। হাফেজ সাহেবের কঠোর সাধনা এবং জনাব হাফেজ ফখরুদ্দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় দিল্লীতে কাজ সুশৃঙ্খল ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিল। কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ, কাজের শৃঙ্খলা বিধান ও পরস্পর জানাজানি গভীর করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে নিজামুদ্দিন রাত্রিবাসে এবং মাসের শেষ বৃহস্পতিবার দিন জামে মসজিদে সমবেত হইয়া প্রত্যেক জামাতের এক মাসের কাজের পূর্ণ প্রতিবেদন পেশ করিবার নিয়ম প্রবর্তিত হইল। জামে মসজিদের এই মাস শেষের সমাবেশে পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে পরামর্শ করিবারও ব্যবস্থা হইল। হযরত মাওলানা নিজে এই মাসিক সমাবেশে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে যোগ দিতেন, অন্যান্য আলেম-বুজুর্গগণকেও সমবেত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। জুমার রাত্রি নিজামুদ্দিনে অতিবাহিত করিবার জন্য সকলকে তাকিদ করিয়া দাওয়াত দিতেন। যে সব লোক কয়েকরাত্রি নিজামুদ্দিনে আসিয়া কাটাইতেন তাঁহাদের মধ্যে এই কাজের প্রতি এক প্রকার রূহানী সম্পর্ক গড়িয়া উঠিত। সমবেত সকলেই রাত্রের খানা একত্রে বসিয়া খাইতেন। এশার নামাজের আগে ও পরে হযরত মাওলানা নিজে অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় বয়ান রাখিতেন। সমবেত সকলকে এই কাজে মনে-প্রাণে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করিতেন, তাঁহার বক্তৃতা অনেক সময় ওজস্বিনী হইয়া উঠিত। কখনও কখনও আবেগময়তায় ডুবিয়া যাইতেন। অনেক সময় সবার অলক্ষ্যে রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া যাইত। ফজর বাদও অধিকাংশ সময় হযরত মাওলানা নিজেই বয়ান রাখিতেন। উপস্থিত উলামাগণের মধ্যে যাহার বর্ণনাভঙ্গী পছন্দ হইত এবং এই কাজের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মানুষকে বুঝাইয়া বলিবার দক্ষতা সম্পর্কে যাহার প্রতি আস্থা জন্মিত–এই ধরনের কোন কোন লোককে দিয়াও তকরির করাইতেন। ফজরের নামাজে অনেক নব্য শিক্ষিত

এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি, এমন কি সমাজের বিশিষ্ট কর্ণধারগণ পর্যন্ত শামিল হইতেন। জামেয়া মিল্লিয়ার কিছু সংখ্যক সম্মানীয় অধ্যাপক এবং ডক্টর জাকির হোসেন মরহুম প্রায় প্রত্যেক দিনই ফজরের জামাতে আসিয়া শামিল হইতেন এবং বয়ান শেষ হওয়ার পর ফিরিয়া যাইতেন। প্রতিদিন সকাল বেলার বয়ান, বিশেষতঃ জুমার রাত্রের হৃদয়গ্রাহী আলোচনা শ্রবণ করিয়া হাজেরীনদের মধ্যে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি হইত, ঘুমন্ত আত্মা যেন কোন এক পরশ পাথরের ছোঁয়ায় নতুনভাবে জাগিয়া উঠিত। ফলে প্রত্যেকেই এই সাপ্তাহিক রাত্রি-যাপনের মধ্যে নতুন নতুন লোক নিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেন, দিনে দিনে জমায়েতের কলেবর বৃদ্ধি হইতে থাকিত। যেই আসিতেন তাঁহার আত্মার জগতে এবং চিন্তাধারার দিগন্তে নতুন আলোক রেখার সূত্রপাত হইত, কাজের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যাইত।

দিল্লীর ব্যবসায়ী মহলে সাড়া

দিল্লীর ব্যবসায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হযরত মাওলানার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপোষণ করিতেন। বয়োবৃদ্ধদের অনেকেই হযরত মাওলানার মরহুম পিতার আমল হইতেই এই খান্দানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, হযরত মাওলানার সংস্পর্শে আসিবার ফলে সেই সম্পর্ক আরো গভীরতর হইয়াছিল। যুবকদের কেহ কেহ খান্দানীভাবেই সম্পর্কের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, অনেকেই উদ্যোগী হইয়া আসিয়া মাওলানার সঙ্গে সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। মেওয়াতের বাহিরে যাহাদের ভাগ্যে মাওলানার প্রতি গভীর ভালবাসা, তাঁহার কাজের প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা ছিলেন দিল্লীর এই ব্যবসায়ী সমাজ। মাওলানার ডাকে ইহারা সব সময়ই প্রাণ খুলিয়া সাড়া দিতেন। বিশেষতঃ জুমার রাত্রিতে ইহারা অবশ্যই নিজামুদ্দিনে নিয়মিত মাহফিলে আসিয়া সমবেত হইতেন। অধিকাংশ সময় রাত্রি সেখানেই কাটাইতেন। মেওয়াতের এজতেমাগুলিতে ইহারা দলে দলে মোটর-লরীতে করিয়া শরীক হইতেন। দিল্লী হইতে খানা সঙ্গে নিয়া দূরাগত মুসলমানগণের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিতেন। মেওয়াতীদের সঙ্গে একত্রিত হইয়া আশ পাশের গ্রাম-বস্তিতে গাশ্ত করিতে যাইতেন।

হযরত মাওলানাও দিল্লীতে ইহাদের সমস্ত ক্রিয়া-কর্মে শরীক হইতেন। তাহাদের সকল সুখ-দুঃখের সঙ্গী হইতেন। সুখে আনন্দিত হইতেন, দুঃখে ব্যথিত হইতেন। তাঁহার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেকটি পরিবারের বয়োকনিষ্ঠদের প্রতি পিতৃসুলভ মমতা পোষণ করিতেন। কিন্তু কোন অনুষ্ঠানে এমনকি ব্যক্তিগত

সাক্ষাতকারের সময়ও নিজের উদ্দেশ্যের কথা ভুলিতেন না। দাওয়াতের কাজ সমভাবেই চালাইয়া যাইতেন। তাহাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের সার্বিক এসলাহ্ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। দ্বীনের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার পথ বাতাইতেন। বয়োবৃদ্ধগণ, বিশেষতঃ মোহ্তারম পিতা এবং বড় ভাইয়ের বন্ধুস্থানীয় লোকজনের সঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মেলামিশা করিতেন। তাঁহাদের বিশেষ মর্যাদার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখিতেন। কিন্তু দ্বীনি কাজে কোন সময় কোন প্রকার গাফলতি হইয়া গেলে শক্ত তাকিদ করিতে ছাড়িতেন না, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু হাজার রাগ করিবার পরও তাঁহাদের গভীর সম্পর্কের মধ্যে কখনও কোন ব্যত্যয় ঘটিতে দেখা যায় নাই।

তবলীগের কাজে নিয়মিত অংশগ্রহণ, আলেম-উলামাগণের সহিত উঠা-বসা ও নিয়মিত তবলীগের সফর, বিশেষতঃ হযরত মাওলানার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বারা এই সমস্ত ব্যবসায়ী লোকের আখলাক-আদত, লেন-দেন এবং কাজ-কারবারে লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হয়। হযরত মাওলানা খুঁটিনাটি বিষয় খুব বেশি উত্থাপন করিতেন না। কিন্তু দ্বীনের প্রতি মহব্বত পয়দা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মধ্যেই দ্বীনি লেবাস-পোশাক ও ভাবধারা আপনা-আপনিই ফুটিয়া উঠিত। দেখিতে দেখিতে এমন এক সময় আসিল, যখন দেখা গেল, যাহাদের মুখে দাড়ি ছিল না, আপনা-আপনিই তাঁহারা দাড়ি রাখিলেন। সব সময় যাহারা বিজাতীয় এবং বিলাসপূর্ণ পোশাকে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁহাদের লেবাস-পোশাক ইসলামী ছাঁচে পরিবর্তিত হইয়া যাইতে লাগিল। এক কথায় নিজেদের সমাজের মধ্যেও তাহারা অতি সহজেই একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা ও সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেন। এই সমস্ত লোককে দেখিয়া যে কেহ বলিয়া দিতে পারিত যে, ইহারা তবলীগের কাজে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরিবর্তন এমন এক পর্যায়ে গিয়া পৌছিল যে, এক সময় যাঁহারা কোন কর্মচারী নামাজে চলিয়া গেলে তা কারবারের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা নিজেরাই দোকান-পাট ফেলিয়া তবলীগের জন্য বাহির হইয়া যাইতে শুরু করিলেন। গাড়ী ছাড়া যাঁহারা এক পা অগ্রসর হইতেন না, সামান্য কিছু জিনিসপত্র হাতে নিয়া পথ চলিতে যাহাদের আত্মসম্মানে বাধিত, তাহারাও বিছানাপত্র, ঘটিবাটি কাঁধে বহন করিয়া মাইলের পর মাইল পথ চলায় অবলীলাক্রমে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গরীব জনগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ানো, মাটির বিছানায় শয়ন করা বা সঙ্গী-

সাথীদের যে কোন খেদমত করাকে তাঁহারাই অত্যন্ত গৌরবের কাজ বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মনোভঙ্গী এবং পরিবেশের পরিবর্তনে ইহাদের জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হইল, এমন ব্যাপক পরিবর্তনের নজীর সমকালের ইতিহাসে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

সম্পদশালীদের ব্যাপারে মাওলানার উছুল

দিল্লী এবং অন্যান্য এলাকার ধনিক সম্প্রদায়ের বহুলোক তবলীগী কাজের সুনাম শ্রবণ করিয়া এবং নিজেরা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করিয়া চাঁদা হিসাবে বিরাট অঙ্কের টাকা নিয়া হাজির হইতে শুরু করিলেন। কিন্তু টাকা-পয়সার ব্যাপারেও হযরত মাওলানার একটা কঠোর নীতি ছিল। তিনি কখনও টাকা-পয়সাকে জানের বদলা, সময়ের বা ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত মনে করিতেন না। টাকা-পয়সাকে তিনি মানুষের হাতের ময়লা বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু ছিল মানুষ। তিনি সবসময় বলিতেন– 'আমি তোমাদের টাকা-পয়সা চাই না, তোমাদিগকেই আমার প্রয়োজন।' যেসব লোক নিজে আসিয়া সক্রিয়ভাবে কাজে শামিল হইতেন, মাওলানা শুধুমাত্র তাহাদেরই টাকা-পয়সা গ্রহণ করিতেন। তাঁহার মতে, আল্লাহর পথে দান করিবার ইহাই ছিল সহীহ্ পন্থা। প্রথম যুগের মুসলমানের মধ্যে দ্বীনের জন্য সম্পদ উৎসর্গ করিবার ব্যাপারে যাহাদের নাম মশহুর হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারাও প্রথমে নিজেরা আসিয়া কাজে যোগ দিয়াছেন, প্রত্যেক কাজে সকলের আগে আগে রহিয়াছেন এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জানের সঙ্গে সঙ্গে মালও উৎসর্গ করিয়াছেন। নেপথ্যে থাকিয়া শুধু আর্থিক সাহায্য দ্বারা দ্বীনের কাজে সহযোগিতা করিবার নজীর ইসলামের সোনালী যুগে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

যে সমস্ত লোক দ্বীনের কাজে হযরত মাওলানার সঙ্গে থাকিয়া পূর্ণ উদ্যমে অংশগ্রহণ করিতেন এবং যাঁহাদের মেহনত' মহব্বত এখলাসের ব্যাপারে মাওলানার পুর্ণ আস্থা জন্মিত, শুধুমাত্র তাঁহাদের দেওয়া টাকা-পয়সাই গ্রহণ করিতেন। একমাত্র তাহাদিগকেই দ্বীনের কাজে দৈহিক শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে মালের কুরবানী দেওয়ার সৌভাগ্যে শরীক করিতেন। হযরত মাওলানার জান-নেছার সঙ্গীদের মধ্যে দিল্লীর সদর বাজারের হাজী নাছিম সাহেব বটনওয়ালা এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুহম্মদ শফী কুরাইশীর ভাগ্যেই এই সৌভাগ্য সর্বাপেক্ষা বেশি ঘটিয়াছিল। এই দুই মহৎপ্রাণ ব্যক্তির টাকা-পয়সা বা সামানাদি ব্যবহার করিবার

ব্যাপারে হযরত মাওলানার কোন দ্বিধা বা সংকোচ ছিল না। এছাড়াও আরও কতিপয় উৎসর্গীতপ্রাণ কর্মী এমন ছিলেন, যাঁহারা দ্বীনের এই কাজে প্রথমে জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা কুরবান করিয়া দিয়াছিলেন, যে কোন প্রয়োজনের সময় মাওলানা ইহাদের মাল–সামান ব্যবহারের ব্যাপারেও কোন দ্বিধা করিতেন না।

মেওয়াতের জলসা

অধিকাংশ সময় মাসে একবার মেওয়াতের কোন না কোন এলাকায় তবলীগী এজতেমা হইত। নূহ নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায়ও বৎসরে একবার জাঁকজমকের সহিত সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইত। দিল্লীর তবলীগী জামাতসমূহ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক লোক, নিজামুদ্দিনের লোকজন, দেওবন্দ, সাহারানপুর, নদওয়া এবং দিল্লীর ফতেপুরী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণের মধ্য হইতে অনেকেই এই সমস্ত মাহফিল ও এজতেমায় শরীক হইতেন। হযরত মাওলানা জামাতের বিশিষ্ট সঙ্গী-সাথীগণকে সঙ্গে নিয়া প্রত্যেকটি সমাবেশে তশরিফ নিতেন। পথে পথেও তবলীগ সম্পর্কে দাওয়াত দিতে থাকিতেন, কাজের আদব এবং নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিতে করিতে চলিতেন। মোটরে বা রেলে যেসব লোক সঙ্গে চলিতেন, তাঁহারা সকলেই এই আলোচনার দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইতেন। নিজামুদ্দিন হইতে মেওয়াত পর্যন্ত এই সফরটিও একটি চলন্ত মাহফিলের রূপ ধারণ করিত।

বস্তির লোকেরা হযরত মাওলানার আগমনবার্তা শুনিয়া দলে দলে বাহির হইয়া আসিত। গন্তব্য স্থানের অনেক দূরে আসিয়া মাওলানাকে ঘিরিয়া ধরিত। মাওলানা এস্তেকবালের জন্য আগত সকলের সঙ্গেই মোসাফাহা করিতেন। তারপর শিশু-যুবা-বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া জলসাগাহ্ পর্যন্ত তাঁহাকে নিয়া আসিত। গন্তব্যস্থলে আসিবার পর অগণিত মানুষ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত। হযরত মাওলানা এক এক করিয়া সকলের সহিত মোসাফাহ্ এবং কাহারও কাহারও সহিত মোয়ানাকা করিতেন, কাহারো মাথায় হাত রাখিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে বসিয়াই কথাবার্তা শুরু করিতেন।

জলসা বা এজতেমার সময়ে হযরত মাওলানা সবসময় গরীব মেওয়াতীদের মধ্যে অবস্থান করিতেন। রাতে অধিকাংশ সময় মসজিদের হুজরায় অথবা

ছেহেনে শয়ন করিতেন। সারাদিন এবং রাত্রের অধিকাংশ প্রহর সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনার মধ্যে কাটাইয়া দিতেন। মেওয়াতের এলাকায় পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই হযরত মাওলানার অন্তরে যেন কি এক নূতন উদ্যম সৃষ্টি হইত, এক অপার্থিব আনন্দে চিত্ত ভরিয়া উঠিত। যবান হইতে দ্বীনের কথা, এলেম ও মারেফাতের কথা উত্থিত ফোয়ারার ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকিত। মেওয়াতী জনগণ হয়ত সব কথা বুঝিত না, কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইত। এই সমস্ত সফরে মাওলানা খুব কম সময়ই চুপচাপ থাকিতেন, আরামও করিতেন নামে মাত্র। ফলে অধিকাংশ সময় মেওয়াত হইতে ফিরিয়া তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, গলার আওয়াজ বসিয়া যাইত, অনেক সময় গায়ে জ্বর নিয়া দিল্লী পৌঁছিতেন।

এই সমস্ত এজতেমাগুলিতে এমন এক রূহানী পরিবেশ সৃষ্টি হইত যে, কঠিন হইতে কঠিনতর অন্তরবিশিষ্ট মানুষেরাও হৃদয়-মনে নূরানী তাসির অনুভব করিত; মন নরম হইয়া যাইত। আল্লাহর জিকিরে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিত। মসজিদগুলি আল্লাহ্ ওয়ালাদের সমাবেশে আবাদ হইয়া যাইত। একটু সামান্য দেরী হইলেই মসজিদে স্থান পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িত। অলিগলিতে পর্যন্ত নামাজীদের কাতার বসিয়া যাইত। শেষরাত্রের দিকে দেখা যাইত, কষ্টসহিষ্ণু মেওয়াতী আল্লাহর বান্দারা মসজিদের ছেহেনে গাছের নিচে কঠিন শীতের সময়ও সামান্য সূতীর চাদর মুড়ি দিয়া খোলা আকাশের নীচে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে। শীতের দিনেও বৃষ্টির মধ্যে শিশিরের ফোটার ভিজা কাপড়ে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বসিয়া বসিয়া উলামাদের ওয়াজ-নসিহত শ্রবণ করিতেছে। কোন চাঞ্চল্য বা অধৈর্যের কোন লক্ষণ কোথাও দেখা যাইত না।

এই সমস্ত সভা-সমাবেশের কার্যক্রমের মধ্যে ওয়াজ-নসিহতের ভূমিকা ছিল গৌণ। আসল উদ্দেশ্য হইত নূতন নূতন জামাত তৈয়ারী করিয়া বাহিরে প্রেরণ করিবার বিরামহীন প্রচেষ্টা। এক একটি সভা হইতে কতকগুলি জামাত ইউপি'র বিভিন্ন-এলাকা সফর করিবার জন্য তৈয়ারী হইল, কতজন লোক কি পরিমাণ সময় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল– এই হিসাবই ছিল সভার কামিয়াবীর মাপকাঠি। হযরত মাওলানা এই ব্যাপারেই ক্রমাগত উৎসাহ এবং তাকিদ দিতে থাকিতেন। মাঝে মাঝে খবর নিতেন, তাঁহার মূল উদ্দেশ্যের পথে সভা কতটুকু অগ্রসর হইতেছে। মেওয়াত এবং নিজামুদ্দিনের দক্ষ মোবাল্লেগগণ উলামা এবং প্রত্যেক গোত্রের মাতব্বর ও মিয়াজীদিগকে পৃথক পৃথকভাবে একত্রিত করিয়া

নূতন নূতন জামাত তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্যে স্ব-স্ব প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেন। জামাত তৈয়ারী সম্পর্কে যে পর্যন্ত পূর্ণ এত্‌মিনান না হইত সেই পর্যন্ত কর্মীদের পক্ষে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়া কিংবা খানাপিনা করা কঠিন হইয়া পড়িত। হযরত মাওলানা যে পর্যন্ত না জামাতের সংখ্যা দেখিয়া পূর্ণ তৃপ্ত হইতেন, সেই পর্যন্ত নিজামুদ্দিন ফিরিয়া আসিবার নাম করিতেন না। পরিপূর্ণরূপে তৃপ্ত হওয়ার পরই দিল্লী ফিরিয়া আসিবার প্রস্তুতি নিতেন। মাওলানার নিজস্ব মাপকাঠিতে জলসা সফল হইয়া যাওয়ার পর আর কাহারো আবদার বা দাওয়াত-জিয়াফতের পীড়া পিড়িতেও মাওলানাকে সেখানে আটকাইয়া রাখা সম্ভবপর হইত না।

কোথাও এজতেমার ব্যবস্থা হইলে নিজামুদ্দিন হইতে আগেভাগে এক দল মোবাল্লেগ গিয়া সেখানকার আশ-পাশের এলাকায় ব্যাপক গাশ্‌ত করিতেন, সভায় যোগদান করিয়া উলামাদের ওয়াজ-নসিহত দ্বারা ফায়দা হাসিল করিবার জন্য লোকদিগকে উৎসাহিত করিতেন। জলসার কাজ শেষ হইয়া যাওয়ার পরও মোবাল্লেগগণ নতুন যাঁহারা কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ হইতেন তাঁহাদের মধ্যে কিছু কাজ করিবার জন্য কয়েকদিন থাকিয়া যাইতেন। সভার দ্বারা যে পরিবেশ সৃষ্টি হইত তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবার জন্য অতিরিক্ত কয়েকদিন মেহনত করিয়া কাজ সুসংহত করিয়া আসিতেন।

হযরত মাওলানা যতদিন অবস্থান করিতেন, ততদিন মেওয়াতের লোকেরা দলে দলে আসিয়া তাঁহার নিকট বায়আত হইত। মুরীদ করিবার সময় তিনি নূতন আগন্তুকদের সম্মুখে তকরির করিতেন, তাঁহার কাজ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতেন এবং মনে–প্রাণে এই কাজে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য অঙ্গীকার করাইতেন। এই সমস্ত মুরীদের প্রত্যেকটি লোকই তবলীগ এবং দ্বীনের জন্য সর্বপ্রকার কুরবানী করিবার ময়দানে এক একজন নতুন সিপাহীর ভূমিকা পালন করিতেন।

প্রতিটি জলসাগাহের আশপাশের লোকেরা বিপুল পরিমাণ বহিরাগত মেহমান এবং মেওয়াতের হাজার হাজার লোককে কয়েক বেলা আহার দিতেন। দিল খুলিয়া মেহমানদারী করিতেন। এতকিছু করিবার পরও আক্ষেপ করিতেন যে, এতটুকু যত্ন করিবার দরকার ছিল, তা করা হইল না। এজতেমাগুলির সময় মেওয়াতের গরীব জনগণ যে মেহমানদারী দেখাইতেন, তাহাতে আরবের ঐতিহ্যবাহী মেহমানদারীর কথা স্মরণ হইয়া যাইত।

মেওয়াতবাসীদের মধ্যে আলেম-উলামা এমনকি সাধারণ মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এমন অভ্যাস উঠিয়াছিল এবং এমনভাবে তাহাদের মন-

মানসিকতা গঠন করা হইয়াছিল যে, বাহির হইতে আগত প্রত্যেকটি লোককে তাহারা পীর-মুরশিদের ন্যায় জ্ঞান করিত, তবলীগের কাজে যাহারা আসিতেন, মেওয়াতবাসীগণ ইহাদের প্রত্যেককেই দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতি এহসানকারী বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিত। আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁহারা প্রকাশ করিত যে, এই সমস্ত আগন্তুকদের অনুগ্রহেই যেন তাঁহারা দ্বীনদারীর অমূল্য রত্ন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সমস্ত গরীব মেওয়াতীদের বিনয়-নম্র ব্যবহার, দ্বীনের প্রতি আকর্ষণ, ইবাদত-বন্দেগী, রাত্রি জাগরণ, মাওলার দরবারে আহাজারী এবং দ্বীন হাসিল করিবার সীমাহীন আগ্রহ দেখিয়া কঠিন হৃদয়ের লোকদের মধ্যেও বিরাট প্রভাব বিস্তার করিত। অনেক বিশিষ্ট লোকও ইহাদের মোকাবেলায় নিজদিগকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া ফিরিতেন। নিজের দৈনন্দিন জীবন এবং আমল-আখলাকের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হইত। ইহাদের তুলনায় নিজেকে অত্যন্ত কালিমালিপ্ত পাপী বলিয়া অনুভূত হইত।

একবার হযরত মাওলানা মেওয়াতের একটি জলসা হইতে ফিরিয়া আসা জনৈক বিশিষ্ট লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন– বল! জলসায় শরীক হওয়ার পর তোমার মনে কি কোন প্রভাব পড়িয়াছে, বা নিজের অবস্থা সম্পর্কে কি আক্ষেপ হইতেছে?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন– হযরত! যা দেখিয়া আসিলাম, তারপর তো নিজেকে আর মুসলমান বলিয়াই মনে হয় না।

নূহ্-এর সম্মেলন

১৩৬০ হিজরীর ৮,৯ ও ১০ই যিলক্বদ মোতাবেক ১৯৪১ সনের ২৮,২৯ ও ৩০শে নভেম্বর তারিখে গোরগাঁও জেলার নূহ্ নামক স্থানে একটি তবলীগী এজতেমার আয়োজন করা হইল। স্মরণকালের মধ্যে মেওয়াত এলাকায় এতবড় জনসমাগম আর কখনও হয় নাই। ত্রিশ-চল্লিশ কোশ হইতে স্ব স্ব খাবার এবং ব্যবহারের ছামান কাঁধে বহন করিয়া হাজার হাজার লোক পায়ে হাঁটিয়া এই মহাসম্মেলনে যোগদান করিয়া ছিলেন। মেওয়াতের বাহির হইতে সহস্রাধিক বিশিষ্ট মেহমানই শুধু সভায় হাজির হইয়াছিলেন। এই সমস্ত মেহমানের জন্য মাদ্রাসার ইমারতে থাকা এবং খাওয়ার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

এই বিশাল সমাবেশে সবিস্তৃত ছামিয়ানার নীচেই জুমার নামাজের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রাহঃ) জুমার খুৎবা দেন এবং নামাজে ইমামতি করেন। প্রত্যেকটি মসজিদে জুমার নামাজের ব্যবস্থা করিবার পরও এই খোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত জামাতের দরুন, দূর দূর পর্যন্ত রাস্তাঘাট এমনকি বাড়ীর ছাদ পর্যন্ত নামাজীদের কাতারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

জুমা নামাজের পর জলসা শুরু করা হইল। এতবড় মহাসম্মেলনের এন্তেজাম করিবার জন্য কোন অভ্যর্থনা কমিটি, কোন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এমনকি সভা পরিচালনার জন্য সভাপতিরও ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু হযরত মাওলানার নিরব কর্মীবাহিনী প্রত্যেকটি কাজ এমন সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতেছিলেন যে, কোথাও কোন অব্যবস্থা বা বিশৃঙ্খলা এমনকি সামান্য একটু শব্দও হওয়ার জো ছিল না। সম্মেলনে অনেক বিশিষ্ট লোকসহ দিল্লী হইতে আগত বহুলোক শরীক ছিলেন। খান বাহাদুর হাজী রশীদ আহমদ, হাজী ওয়াজিহ্ উদ্দীন, মুহম্মদ শফী কুরাইশী প্রমুখ দিল্লীর প্রখ্যাত ব্যবসায়ীগণের একটি দল নিজেদের গাড়ী নিয়া আসিয়াছিলেন। বিশিষ্ট মেহমানগণের আনা-নেওয়ার দায়িত্ব অনেকাংশে তাঁহারা স্বেচ্ছায় নিজেরা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সম্মেলনে অপূর্ব এন্তেজাম দেখিয়া হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ্ (রাহঃ) মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ আমি অগণিত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সভা-সমাবেশে যোগদান করিতেছি, কিন্তু এই জলসার ন্যায় এমন অপূর্ব এন্তেজাম, এমন বরকতপূর্ণ পরিবেশ এবং এমন হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য আর কখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।"

সম্মেলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, সমবেত জনমণ্ডলীর এই বিরাট জমায়েত যেন একটি অস্থায়ী খানকায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। দিনের বেলায় যাহারা সৈনিকের মত এন্তেজামের কাজে নিয়োজিত থাকিতেন, রাত্রের বেলায় ইহারাই এক একজন মরমী ইবাদত-গোযারে পরিণত হইয়া যাইতেন। রাত্রের বেলায় যাঁহারা মাওলার দরবারে সেজদারত অবস্থায় চোখের পানিতে জমিন ভিজাইতেন, দিবসের আলো ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা এক একজন দক্ষ খাদেমে রূপান্তরিত হইয়া যাইতেন। হযরত মাওলানা যে দাওয়াতের কাজ শুরু করিয়া ছিলেন, তার উদ্দেশ্যেও ছিল এই দুইটি চরিত্রের সুসময় এবং পরিপূর্ণ সংযোগ সাধন।

নিয়মিত জলসা চলিবার ফাঁকে ফাঁকে এবং জলসাগার বাহিরে উঠিতে-বসিতে হযরত মাওলানা তাঁহার নিজের কথা বলিতে থাকিতেন। প্রত্যেক

নামাজের পর যে দোয়া হইত, মাওলানার মর্মস্পর্শি সেই দোয়ার ভাষাও এক একটি বক্তৃতার কাজ করিত।

বাহিরের দিকে

মেওয়াত এবং দিল্লীর কাজ একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছিবার পর মেওয়াতের কৃষক, দিল্লীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণের সমন্বয়ে গঠিত একটির পর একটি জামাত যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। একটি পরিকল্পনা মোতাবেক আলীগড়, আগ্রা, বুলন্দ শহর মিরাট, পানিপথ, শোনিপথ, কর্ণাল, রুহতক প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপক সফরের এন্তেজাম করা হইল। কোন কোন এলাকায় জামাত একাকবারও ঘুরিয়া আসিল। সফরের ফলে প্রত্যেক এলাকায় নতুন নতুন স্থানীয় জামাত তৈয়ারী হইল এবং প্রত্যেক এলাকা হইতেই কিছু লোক নিয়মিত নিজামুদ্দিনে আসিতে শুরু করিলেন। করাচীর হাজী আব্দুল জব্বার এবং এম. জে এণ্ড জি ফজল এলাহী কোম্পানীর মালিক হাজী আব্দুস সাত্তার তবলীগের সুনাম এবং হযরত মাওলানার বৈপ্লবিক কর্মধারার কথা শুনিয়া দিল্লীতে আসিয়া কাজের সংগে সংযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্যোগে একটি জামাত হিজরী ৬২ সনের সফর মাস মোতাবেক ৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এবং অন্য আর একটি জামাত এপ্রিল মাসে মাওলানা সৈয়দ রেজা হাসান সাহেবের নেতৃত্বে করাচী রওয়ানা হইয়া গেল। এই জামাতের প্রচেষ্টাতেই করাচীর বিভিন্ন মহল্লায় এবং সিন্ধু প্রদেশের কয়েকটি স্থানে কাজ শুরু হইল।

উপকূলীয় শহরগুলিতে ব্যাপকভাবে কাজ শুরু করিবার ব্যাপারে হযরত মাওলানার আন্তরিক আগ্রহ ছিল দীর্ঘ দিনের। কেননা, আরব সাগরের তীরবর্তী বিভিন্ন বন্দরগুলিতে বিপুল সংখ্যক আরব নানা কাজে যাতায়াত করিত। অনেকে এই সমস্ত শহরে স্থায়ীভাবে বসবাসও করিত। মাওলানার আশা ছিল, বন্দরগুলিতে ব্যাপকভাবে কাজ শুরু হইলে তা বহিরাগত লোকদের মধ্যে অতি সহজে বিস্তারলাভ করিবে এবং এইভাবে তবলীগের দাওয়াত দেশ হইতে দেশান্তরে বিশেষতঃ আরব দেশগুলিতে ছড়াইয়া পড়িতে সহায়ক হইবে।

লাখনৌ সফর

হিজরী ৫৯ সনের শুরুর দিক হইতেই লাখনৌর নাদওয়াতুল উলামার ছাত্র ও শিক্ষকগণ হযরত মাওলানার উসুল অবলম্বন করিয়া শহর এবং আশ পাশের এলাকায় কিছু কিছু কাজ করিতে শুরু করিয়াছিলেন। ছুটির সময় এবং বিভিন্ন

জলসা-এজতেমা উপলক্ষে এখানকার কিছু লোক হযরত মাওলানার খেদমতে নিয়মিত যাইয়া হাজিরাও দিতেন। ফলে হযরত মাওলানা ব্যক্তিগতভাবে লাখনৌর জামাতের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই জামাতের প্রত্যেকটি কার্যবিবরণী অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন এবং জামাতের লোকজনের প্রতি বিশেষ স্নেহের দৃষ্টি রাখিতেন।

হিজরী ৬২ সনের রজব মাসে হযরত মাওলানা লাখনৌ সফরের দাওয়াত রাখিলেন। তাঁহার আগমনের এক সপ্তাহ আগেই মেওয়াতের প্রবীণ কর্মীবৃন্দ এবং দিল্লীর ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিশ-চল্লিশ জনের একটি জামাত লাখনৌ পৌঁছিয়া কাজ শুরু করিলেন। নাদওয়াতুল উলামার ইমারতেই ইঁহাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করা হইল। এই জামাত আসরের নামাজের পর দারুল উলুম হইতে বাহির হইয়া মাগরেব বাদ কোন একটি মহল্লায় কাজ করিতেন। এশার পর কোন এক মসজিদে কিছুক্ষণ বয়ান রাখিয়া নতুন জামাত তৈরী করিতেন এবং জামাতকে কাজের নির্দেশ দিয়া বাসস্থানে ফিরিয়া আসিতেন। ফিরিয়া আসিতে আসিতেই রাত বারটা-একটা বাজিয়া যাইত। ফজরের পরই তবলীগী জামাতের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম তালীমের কাজ শুরু হইয়া যাইত। তালীমের মধ্যে কোরআনের তাজবিদ এবং মাখরাজ শুদ্ধ করিয়া পড়ার অভ্যাস করিবার জন্য কিছু সময়, কিছু সময় জরুরী মাসআলা-মাসায়েল আয়ত্ত করিবার জন্য এবং কিছু সময় সাহাবায়ে-কেরামের জীবন কথা এবং জেহাদে আত্মত্যাগের কাহিনী শ্রবণে, অবশিষ্ট কিছু সময় তবলীগের নিয়ম-পদ্ধতি ও মূলনীতি শিক্ষার মধ্যে ব্যয়ীত হইত। সব কাজকর্ম শেষ হওয়ার পরই খানা ও বিশ্রামের সময় আসিত। আসরের নামাজের পর পুনরায় গাশতের কাজ শুরু হইত।

জুলাই মাসের ১৮ তারিখ হযরত মাওলানা নিজে হাফেজ ফখরুদ্দিন, মাওলানা এহতেশামুল হাসান, জনাবা মুহম্মদ শফী কুরাইশী এবং হাজী নাছিম সাহেবানকে সঙ্গে নিয়া লাখনৌ পৌঁছিলেন। মতিমহলের পুলের সন্নিকটবর্তী ময়দানে নফল নামাজ পড়িয়া দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দোয়া করিলেন।

দারুল-উলুম-নাদওয়াতুল উলামায় পৌঁছিয়া সর্বপ্রথম মসজিদে চলিয়া গেলেন। সেখানে জামাতের লোকেরা তখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া তালীমের কাজে লিপ্ত ছিলেন। হযরত মাওলানার প্রতি সীমাহীন ভক্তিশ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও কোন একজন লোকও তালীম ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন না, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নিজ নিজ কাজে লিপ্ত রহিলেন। মাওলানা একবার সকলের প্রতি স্নেহমাখা দৃষ্টি

বুলাইয়া জামাতের আমীর হাফেজ মুকবুল হাসান সাহেবের সহিত মোসাফাহ্ করিলেন এবং সামান্য কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিলেন।

হযরত মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী একদিন আগেই পৌছিয়াছিলেন এবং হযরত মাওলানার সঙ্গেই তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইতিপূর্বে থানাভবন রেলস্টেশন এবং সেখান হইতে কান্দালা পর্যন্ত যাওয়ার পথে মাওলানার সহিত কয়েক ঘন্টার জন্য তাঁহার সাক্ষাতকার হইয়াছিল এবং এই অবসরে তবলীগের কাজ সম্পর্কে কিছু মতবিনিময়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। লাখনৌর ফাটক হাবসীখান নামক স্থানে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে মাওলানা নদভী দীর্ঘ বক্তৃতায় তবলীগের দাওয়াত সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ ভাষণদান করিয়াছিলেন। এই সফরে আট-নয় দিন উভয়ে এক সঙ্গে থাকার সুযোগ হয়।

দ্বিতীয় দিন শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া সাহেব মাওলানা মনযুর নোমানী ও মাওলানা আব্দুল হক মদনী এবং মাজাহেরুল উলুম মাদ্রাসার কতিপয় শিক্ষক আসিয়া পৌছেন।

লাখনৌতে অবস্থানের সময় পর পর তিনদিন চৌধুরী নাযিমুল্লাহ্ সাহেবের বাড়িতে বরং দুইদিন শায়খ ইকবাল আলী সাহেবের বাসভবনে আসর বাদ বিশিষ্ট লোকদের বৈঠক হয়। এই বৈঠকগুলিতে হযরত মাওলানা দাওযাত ও তবলীগের বিস্তারিত ব্যাখা প্রদান করিয়া অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিন সকাল হইতে জোহর পর্যন্ত যে সমস্ত লোক আসিয়া সমবেত হইতেন, তাঁহাদের সকলের সহিতই হযরত মাওলানা বিরামহীনভাবে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিতেন। জোহরের পর হইতে আসর পর্যন্ত দারুল-উলুমের মসজিদে সাধারণ সভার কাজ শুরু হইত। হযরত মাওলানা সবগুলি মাহফিলেই তাৎপর্যপূর্ণ বয়ান দিতেন। তাঁহার প্রত্যেকটি ভাষণই এলেম ও মারেফাতের তত্ত্ব ও তথ্যে ভরপুর থাকিত।

লাখনৌতে অবস্থানের সময় মাওলানা প্রখ্যাত প্রবীণ আলেম হযরত মাওলানা আব্দুস্ শাকুর সাহেবের সঙ্গে নিজে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। ঐতিহ্যবাহী ফিরিঙ্গমহল পরিবারের মাওলানা কুতুব মিয়া সাহেব সাক্ষাৎ করিতে আসেন। হযরত মাওলানা সৌজন্য সাক্ষাতকারের উদ্দেশ্যে এল্‌মে-দ্বীনের প্রাচীন তীর্থভূমি ফিরিঙ্গমহলে তশ্‌রিফ নিয়া যান। পথিমধ্যে কিছুক্ষণের জন্য "এদারায়ে তালীমাতে ইসলামের" কার্যালয়েও কিছু সময় কাটান।

শেষদিন ছিল জুমাবার। এইদিন হযরত মাওলানা লাখনৌতে অত্যন্ত কর্মব্যস্ত দিন অতিবাহিত করেন। সকালে ছাত্র সংগঠন জমিয়াতুল এসলাহ্ কর্তৃক আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার পর আমিরুদ্দৌলা ইসলামিয়া কলেজে তশরিফ নিয়া যান। এখানে পূর্ব হইতেই অগণিত জনতা তাঁহার আগমনের অপেক্ষা করিতেছিল। মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভীর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের পর হযরত মাওলানা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বয়ান রাখেন।

এই অনুষ্ঠান হইতে সোজা মামু-ভাগ্নের কবরওয়ালা মসজিদে জুমার নামাজ পড়িতে যান। নামাজের পর এইখানে ওয়াজ শুরু হয়। পর পর কয়েজন বক্তা মজলিসের লোকজনকে দিল্লীর জামাতের সহিত কানপুর যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করিতে থাকেন। মাওলানা মসজিদের ভিতরভাগেই উপবিষ্ট ছিলেন। দেখিতে পাইলেন, এত বক্তৃতার পরও কোন একটি লোকও সময় দেওয়ার জন্য তৈরী হইতেছে না। এই অবস্থা দেখিয়া মাওলানা যেন অস্থির হইয়া পড়িলেন। দ্বীনের এই দাওয়াত-মাওলানার ধারণায় যা ছিল বর্তমান ফেতনার যুগে দ্বীন শিক্ষা করিবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। সেই তবলীগের জন্য সময় দেওয়ার ব্যাপারে মজলিসে উপস্থিত লোকদের এই নিরুত্তাপ-অনীহার দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার অন্তর বেকারার হইয়া পড়িল। উঠিয়া গিয়া নিজ হাতে মসজিদের সবগুলি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং সভার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কাজে যোগ দেওয়ার জন্য লোকজনকে অনুরোধ করিত শুরু করিলেন। দুই-একজনকে দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে,· "আপনার কি অসুবিধা? ঘর-সংসার এবং রোজী-রোজগারের কাজে সময় দেওয়ার ব্যাপারে তো আপনাদের কোন আলস্য দেখা যায় না, আল্লাহর পথে সামান্য সময় ব্যয় করিবার ব্যাপারে এত উপেক্ষা প্রদর্শনের কারণ কি?" এই সময় মাওলানার সারাসত্তা যেন আত্মময় হইয়া কথা বলিতেছিল। হাজী ওয়ালী মুহম্মদ নামক একব্যক্তি অর্শরোগে কাতর হইয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। মাওলানা তাঁহার প্রতি ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– আপনার কি অসুবিধা, আপনি রাজী হইতেছেন না কেন? হাজী সাহেব নিবেদন করিলেন– হযরত! আমি তো মরিতে বসিয়াছি, আমার পক্ষে বাহির হওয়া সম্ভব হইবে কিরূপে?

মাওলানা জবাব দিলেন, মরিতেই যদি হয় তবে কানপুর যাইয়াই মরুন না কেন? এই কথা বলার পর তিনি সম্মত হইলেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে সহী-সালামতেই তাঁহার সফর কাটিয়া গেল। এছাড়া মাওলানার উপর্যুপরি তাকিদের পরও আট-দশজন রাজী হইলেন। পরবর্তী যুগে এই সমস্ত লোক অবশ্য অত্যন্ত উৎসাহী কর্মীতে পরিণত হইয়াছিলেন।

রাত্রের গাড়ীতে শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া সাহেব, হাফেজ ফখরুদ্দিন সাহেব এবং আরও কতিপয় সঙ্গীসহ হযরত মাওলানা রায় বেরিলীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া গেলেন। সূই নদীর তীরে হযরত আদম বিন্নৌরীর খলীফা হযরত সৈয়দ এলমুল্লাহ্ কর্তৃক আবাদকৃত একটি ক্ষুদ্র জনপদ ছিল তাঁহার গন্তব্যস্থল। এই খান্দানেই উপমহাদেশের লৌহ মানব হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কষ্টদায়ক সফর এবং সারারাত্রি জাগরণের সকল ক্লান্তি ভুলিয়া গিয়া হযরত মাওলানা গন্তব্যস্থলে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই ঐতিহ্যবান এই খান্দানের লোকজনের সম্মুখে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করিতে লাগিয়া গেলেন। যাহাদের ধমণীতে আল্লাহর রসূলের পবিত্র রক্তের উত্তরাধিকার রহিয়াছে দ্বীনের কাজের সহিত তাহাদের আত্মার সম্পর্ক এবং তাহাদের দ্বারা দ্বীনি কাজের মধ্যে যে বরকত হইতে পারে সেই সম্পর্কে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ভাষণদান করেন। মাওলানা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে, সৈয়দ খান্দানের লোকেরা যদি দ্বীনের কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে আত্মনিয়োগ করেন তবে সেই কাজে তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত বরকত বা শান্তি নসীব হইবে না। অপরপক্ষে তাঁহাদের দ্বারা দ্বীনের কাজ যত সহজে অগ্রসর হইবে, অন্যদের দ্বারা কাজ ততটুকু সহজে হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাঁহারাও এই কাজের মধ্যে প্রকৃত আত্মিক শান্তি লাভ করিবেন।

রায় বেরিলী হইতে দ্বিপ্রহরের গাড়ীতেই লাখনৌ ফিরিয়া আসিলেন এবং ষ্টেশন হইতেই কানপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া গেলেন। দুইদিন কানপুরে অবস্থান করিবার পর দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অসুস্থতা ঃ জীবনের শেষ দিনগুলি

বাল্যকাল হইতেই হযরত মাওলানা শারীরিক দিক দিয়া অত্যন্ত দুর্বল এবং স্বাস্থ্যহীন ছিলেন। তবলীগের কাজে সীমাহীন মেহনতের ফলে ভগ্ন স্বাস্থ্য দিনে দিনে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পেটের পীড়া ছিল তাঁহার অনেকটা বংশগত রোগ, বিরামহীন সফর এবং রাত্রি জাগরণের ফলে পীড়া অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছিল। সফর এবং কাজের সময়ে তাঁহার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অনিয়ম ছিল প্রাত্যহিক ব্যাপার, যার দরুন স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল; পেটের পীড়া বৃদ্ধি পাইতে পাইতে চিকিৎসার অতীত হইয়া দাঁড়াইল। ১৩৪৩ সনের নভেম্বর মাসে সেই পীড়া কঠিন আমাশয়ে রূপ নিল এবং ধীরে ধীরে এমন জটিল হইয়া পড়িল যে, তিনি আর সুস্থ হইতে পারিলেন না। এই অবস্থাতেও কাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং আগ্রহে কোন কমি হইত না। বরং অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার চিন্তা ও প্রেরণা যেন আরও বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। ৪৪ সনের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর এক বন্ধু দিল্লী হইতে পত্রযোগে জানাইলেন ঃ

> আল্লাহর ফজলে বর্তমানে হযরতজী অনেকটা সুস্থ, তবে শরীর অত্যন্ত দুর্বল। চিকিৎসকগণের কঠোর নিষেধ সত্ত্বেও কথাবার্তা বন্ধ করিতেছেন না। বরং বলেন যে, তবলীগের জন্য কথা না বলিয়া স্বাস্থ্য উদ্ধার করিবার চাইতে বলিতে বলিতে মৃত্যুবরণ করাকে আমি শ্রেয় মনে করি। অনেক সময় বলিতে থাকেন– "আমার এই অসুস্থতার কারণ হইল, আলেমসমাজ কাজের প্রতি যথার্থ মনোযোগ দিতেছেন না। যাঁরা কাজের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করিতে সক্ষম, সেই আলেমসমাজের আগাইয়া আসা উচিত। সামর্থের অভাবে যদি তাঁহাদিগকে ঋণও গ্রহণ করিতে হয় তবুও যেন তাঁহারা চিন্তিত না হন; আল্লাহ্ পাক বরকত দান করিবেন। আমার অসুস্থতাও তো একটি নেয়ামত, অন্ততঃ এই খবর শুনার পরও লোকজনের আসার দরকার ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়,

যাঁহাদের আসার দরকার তাঁহারা আসিতেছেন না। এই কাজের সীমাহীন বরকত আমি অনুধাবন করিতেছি।" এই সমস্ত কথা বলার সময় বিশেষতঃ শেষের কথা কয়টি উচ্চারণ করিতে করিতে হযরত মাওলানার অবস্থা এমন হইয়া যায়- যা আমি ভাষায় বর্ণনা করিতে পারিতেছি না।

হিজরী ৬৩ সনের ২১ শে মুহররম মোতাবেক ৪৪ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারী তারিখে লাখনৌর একটি জামাত দিল্লীর পথে রওয়ানা হইল। এই জামাতে দারুল-উলুম নাদওয়াতুল উলামার প্রধান পরিচালক মাওলানা এমরান খান এবং হাকীম কাসেম খানও ছিলেন। তাঁহারা যখন সাক্ষাৎ করেন তখনও মাওলানা চলাফেরা করিতে পারেন, অধিকাংশ সময় নামাজ নিজেই পড়ান, তবে এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, অনেক সময় বসা হইতে উঠিতে গিয়া অন্যের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কথাবার্তা এবং ভাষণ-বক্তৃতার নিয়মিত কার্যক্রম সমানভাবেই চলিতেছিল। পীড়া তখন বৃদ্ধি পাইতে পাইতে রীতিমত উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাশ্মীরের মীর ওয়ায়েজ মাওলানা ইউসুফ সাহেব তখন নিজামুদ্দিনে অবস্থান করিতেছিলেন। মাওলানা তখন সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া উলামাগণের পক্ষে এই কাজে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করিবার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। এই সময়ে হযরত মাওলানার ইহাই ছিল আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। আলেম-উলামা এবং যথার্থ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ নিকট-সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার এই তাহ্‌রিকের মর্ম অনুধাবন করুন- ইহাই ছিল এই সময় হযরত মাওলানার প্রধান আকাঙ্ক্ষা। উদ্দেশ্য ছিল যোগ্য ব্যক্তিগণ যেন তাঁহার কাছে কাছে থাকিয়া কাজের প্রকৃত তাৎপর্য উলব্ধি এবং কর্মপন্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গ্রহণ করিয়া এই তাহ্‌রিককে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারেন। আলেম সমাজের প্রতি মাওলানার উপর্যুপরি তাগিদ ছিল; বার বার তিনি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আকুল আহবান জানাইয়া বলিতেছিলেন, "এই কাজের জন্য আপনাদের প্রয়োজন রহিয়াছে, আপনাদেরও কাজের এই পদ্ধতি গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আপনারাই এই আন্দোলনের যোগ্য পাত্র এবং আপনারা যেদিন ইহাকে আপন করিয়া নিবেন, তখনই কাজের যথার্থ প্রসার সম্ভবপর হইবে। আমার ভূমিকা হইতেছে সেই ব্যক্তির ন্যায়- যে কোথাও আগুন লাগিতে দেখিয়া তা নিভাইবার জন্য ডাকাডাকি করিয়া লোকজন জড় করে। আসলে যে ব্যক্তি লোকজন একত্রিত করে আগুন নিভানোর মধ্যে তার তেমন কোন সক্রিয়

ভূমিকা থাকে না, আগুন নিভানোর লোক পরে আসিয়া জড় হয়।"

দিল্লীর মোবাল্লেগ এবং ব্যবসায়ী সমাজকে মাওলানা বারবার তাগিদ দিতেন যেন তাঁহারা যোগ্য আলেমগণকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করেন, এলেম দ্বারা ফায়দা হাসিল করেন। শহরে সভা-সমাবেশের আয়োজন করিয়া জনগণকে তাঁহাদের ওয়াজ-নসিহত শ্রবণ করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিবার সুযোগ করিয়া দেন। তবলীগের কাজেও আলেমসমাজের সমর্থন এবং সহযোগিতা লাভ করিবার যেন চেষ্টা করা হয়। হযরত মাওলানার নির্দেশেই সেই সময় দিল্লীর স্থানে স্থানে ব্যাপকভাবে ওয়াজ-মাহ্‌ফিলের আয়োজন হইতে লাগিল। এই সমস্ত মাহ্‌ফিলে হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেব, মাওলানা আব্দুল হান্নান সাহেব এবং মাওলানা এমরান খানসহ আরও অনেক আলেম-উলামা যোগদান করেন। প্রত্যেকটি সমাবেশেই হযরত মুফতী সাহেব অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তবলীগী তাহ্‌রিকের প্রতি সমর্থন এবং এই কাজের যথার্থতা সম্পর্কে লোকজনকে উপদেশ দান করেন। হযরত মাওলানা তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং উচ্ছ্বসিত ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মাওলানা এই সমস্ত প্রত্যেকটি সভার কার্যবিবরণী শুনার জন্য অধীর আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করিতেন। জলসা হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে অনেক রাত হইয়া যাইত। মাওলানা তখনও জাগিয়া থাকিতেন। লোকজন ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই ডাকিয়া পাঠাইতেন এবং গভীর মনোযোগ সহকারে সভার বিস্তারিত বিবরণ শুনিতেন।

সকালের নাশতা এবং রাতের খানার পর আলোচনা শুরু করিয়া দিতেন। অনেক সময় ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি তাঁহার বক্তব্য বলিয়া যাইতেন। যার দরুন দুর্বলতা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত, সঙ্গীগণ আদবের খাতিরে কিছু না বলিয়া চুপচাপ শুনিতে থাকিতেন।

অসুস্থতার এই পর্যায়েই সাহেবজাদা হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবের পরিচালনায় মেওয়াতের ঘাটমেকা নামক স্থানে হযরতজীর উপস্থিতিতে যে সব সম্মেলন হইল, ঠিক অনুরূপ একটি সফল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল।

আলেম সমাজের মধ্যে চিন্তার ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

হযরত মাওলানার কর্মপ্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল আলেমসমাজের বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যকার মতপার্থক্য কমাইয়া আনিয়া একই সঙ্গে জাতির

বৃহত্তর খেদমতে অংশগ্রহণ করিবার ময়দান প্রস্তুত করিয়া দেওয়া। অনেক সময় ছোটখাটো মতপার্থক্য, পারস্পরিক যোগাযোগ এবং সহযোগিতার অভাবে মনান্তরে রূপান্তরিত হইয়া যায়। মাওলানা এই সমস্ত মতপার্থক্যের গণ্ডী সংকুচিত করিয়া ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে সকলের মেধা এবং কর্মশক্তি একত্রিত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া সকল মত-পথের লোকদের মধ্যেই কাজ শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল, পারস্পরিক দলাদলির মধ্যে যে বিপুল কর্মশক্তির অপচয় হইয়া থাকে, তাহা হইতে বিরত হইয়া পারস্পরিক সহযোগিতা এবং একে অন্যের যোগ্যতা হইতে ফায়দা গ্রহণ করিবার ময়দান প্রস্তুত করিবার চেষ্টা।

মাওলানার ধারণা ছিল, জনগণের সকল স্তরে যদি কাজ ব্যাপক করা না যায়, তবে ধর্মীয় ব্যাপারে পশ্চাদপদ জনগণ এবং আলেম সমাজের মধ্যে মত-পথ ও রুচির পার্থক্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থকিবে, আর এই পরিস্থিতিই জাতির জন্য অত্যন্ত বড় বিপদ এবং ব্যাপক ধর্মদ্রোহীতা ডাকিয়া আনিবে। হযরত মাওলানা আশা করিতেন যে, তাঁহার আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ এবং আলেম সমাজের মধ্যকার রুচি ও ধ্যান-ধারণার পার্থক্য দূর হইয়া পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে। একে অন্যকে সঠিকভাবে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে।

হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবের নেতৃত্বে ঘাটমেকায় অনুষ্ঠিত এজতেমায় মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী মেওয়াতের আলেম সমাজের একটি পৃথক বৈঠকে হযরতজীর উপরোক্ত লক্ষ্যটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমাদের আলেম সমাজ যদি দাওয়াত ও তবলীগের এই কাজের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ব্যাপকতর করিয়া তুলিবার চেষ্টা না করেন, তবে হয়ত বা এমন একদিন আসিবে যখন আলেম সমাজ এই দেশের জন মানুষের মধ্য হইতে দূরে সরিতে সরিতে সম্পূর্ণ পৃথক একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়বিশেষে পরিণত হইয়া যাইবে। তাঁহাদের ধ্যান-ধারণা এবং চালচলন সম্পর্কে জনগণ সম্পূর্ণরূপে বেগানা হইয়া যাইবে। একে অপরের মন-মানসিকতা হইতে বহুদূরে অবস্থানরত এই দুই দলের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য দু'ভাষীর প্রয়োজন দেখা দিলেও তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু থাকিবে না।" হযরতজী মাওলানা ইউসুফ সাহেবের যবানী নদভী সাহেবের উপরোক্ত কথাগুলি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত পছন্দ করিলেন—আনন্দিত হইলেন।

হযরত মাওলানার লক্ষ্য ছিল দাওয়াতের কাজের মাধ্যমে আলেম সমাজকে জনগণের নিকটতর করিয়া দেওয়া এবং পরস্পরের মধ্যে সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়িয়া তোলা। আলেমদের প্রতি তাঁর আবেদন ছিল– তাঁহারা যেন সাধারণ মানুষের প্রতি অন্তরে গভীর দরদবোধ গড়িয়া তুলেন; যথার্থ অর্থে তাহাদের কল্যাণকামীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। অপরদিকে জনসাধারণের প্রতি তাঁহার উপদেশ ছিল-তাঁহারা যেন আলেমগণের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাঁহাদের মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হইয়া তাঁহাদের দ্বারা পূর্ণ ফায়দা হাসিল করিবার চেষ্টায় সব সময় আত্মনিয়োজিত থাকেন। তাহাদিগকে নিয়মিত উলামাদের খেদমতে হাজির হওয়ার তাকিদ দিতেন, আলেমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সওয়াবের কথা জোর দিয়া বুঝাইতেন। তাঁহাদের খেদমতে হাজির হওয়ার আদব-কায়দা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল করিতেন। কাহারো কোন কথা বুঝে না আসিলেও তাঁহার প্রতি সুধারণা পোষণ করিবার অভ্যাস গড়িয়া তুলিবার প্রতি যত্নবান হইতেন। মোবাল্লেগগণকে উলামাদের কাছে পাঠাইতেন এবং ফিরিয়া আসিবার পর জিজ্ঞাসা করিতেন, কিভাবে গেলে? কি কি কথা হইল? কেহ কোনরূপ বিরূপ ধারণা নিয়া আসিলে তা সংশোধন করিয়া দিতেন। এহেন কর্মপন্থা গ্রহণ করিবার ফলে তবলীগী তাহ্‌রিকের মাধ্যমে আলেম সমাজ এবং কৃষক-মজদুর, ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এমন একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে যে, খেলাফত আন্দোলনের দিনগুলি ছাড়া এমন নিবিড় সম্পর্ক নিকট অতীতে আর কোথাও দেখা যাইবে না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে পড়িয়া শহরাঞ্চলগুলিতে আলেম-উলামাগণের একটি বিরাট শ্রেণীর প্রতি সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। উপদলীয় মতপার্থক্যের তীব্রতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলেম-বিদ্বেষের আগুনও ক্রমেই বর্ধিত হইয়া চলিয়াছিল।

হযরত মাওলানার সমন্বয়ি দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিরামহীন চেষ্টার ফলে তবলীগ প্রভাবিত জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সকল মত-পথের উলামায়ে-কেরামের প্রতি দ্বীনি ব্যাপারে সাধারণ ভক্তিশ্রদ্ধার একটা স্বাভাবিক পরিবেশ গড়িয়া উঠিল। যেসব বড় ব্যবসায়ী আলেম-উলামার নাম শুনিয়া নাক সিটকাইতেন, তাঁহাদের অনেকেই তবলীগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার পর হইতে আলেমগণের দরবারে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে হাজির হইতে শুরু করিলেন। সভা-এজতেমার সময় অত্যন্ত বিনয়-নম্রভাবে আলেম-

উলামাগণকে নিয়া যাওয়ার জন্য তাঁহাদেরই উৎসাহ সর্বাপেক্ষা বেশি প্রকাশিত হইতে থাকিল। মৃত্যুশয্যায় হযরত মাওলানা তাঁহার ভক্ত কর্মীগণকে বার বার উলামাগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার তাকিদ করিয়া গিয়াছেন, যারফলে অত্যন্ত সন্তোষজনক সাফল্য ত্বরান্বিত হইয়াছে।

মুসলমানদের বিভিন্ন দল-উপদল

ছোট ছোট মতপার্থক্য এবং একে অপরের সংস্রব হইতে দীর্ঘকাল দূরে অবস্থান করিবার ফলে মুসলমানদের বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে মিল্লাতের বৃহত্তর ঐক্য সম্পর্কিত ধারণা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক জামাতের লোকেরাই অপর জামাতের সংস্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার মধ্যেই দ্বীন-ঈমানের হেফাজত সুনিশ্চিত হইবে বলিয়া মনে করিতেন। কাহার মধ্যে কতটুকু কল্যাণকর ভূমিকা রহিয়াছে, সম্পর্কহীনতার কারণে অন্যের নিকট তাহা একেবারেই অপরিচিত হইয়া গিয়াছিল। ফলে একে অপরের জ্ঞানগরিমা হইতে ফায়দা হাসিল করিবার পথ দীর্ঘকাল হইতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

মত-পথের এই পার্থক্য দূর করিবার পন্থা হিসাবে প্রত্যেকেই অপরের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া, নিজেদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অপর পক্ষের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার মধ্যেই সকল শক্তি নিয়োগ করিতেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়াছে– বহছ-মুনাজারার দ্বারা মতপার্থক্য দূর না হইয়া বরং তা আরও বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছে। একের প্রতি অপরের বিদ্বেষ এবং মতপার্থক্য আরও তীব্রতর হইয়াছে।

এই ব্যাপারে হযরত মাওলানার কর্মপন্থা ছিল পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া মহব্বত ও আখলাকের সহিত মনান্তরের এক একটি গ্রন্থি খোলার চেষ্টা করা। পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়া একে অপরের নিকটে আসিবার ব্যবস্থা করা। যাতে পরস্পরের আদান-প্রদান ও সুসম্পর্কের দ্বারা পরস্পরকে গভীরভাবে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। এই জানা-শুনার সম্পর্ক যতই গভীরতর হইবে, মতপার্থক্যের তীব্রতাও সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকিবে। একসঙ্গে বৃহত্তর ময়দানে কাজ শুরু করিবার পর ছোটখাট এখতেলাফ দূর হইয়া পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক কায়েম হইয়া যাইবে। অর্থহীন বাড়াবাড়ির আর কোন অবকাশই থাকিবে না।

জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিতে হযরত মাওলানা মিল্লাতের এই মহাগুরুত্বপূর্ণ

দিকটির প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব আরোপ করিতে থাকেন। সঙ্গী-সাথীগণকে এই ব্যাপারে তিনি এমন সব সূক্ষ্ম পন্থা অবলম্বন করিবার উপদেশ দিতেন যা রাজনৈতিক ময়দানের অনেক দক্ষ নেতার মধ্যেও হয়ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

আলেম-উলামাগণের মধ্যে যাঁহাদের সঙ্গে মাওলানার কোন সম্পর্ক ছিল না বা যাহারা কোন সময় তাঁহার কাজের প্রতি সমর্থন দেন নাই, এই ধরনের কোন বিশিষ্ট মেহমান যদি নিছক রুগ্ন মাওলানাকে দেখিবার জন্যও কখনও চলিয়া আসিতেন, নিজামুদ্দিনের মসজিদে তাঁহাদের আদর-আপ্যায়ন এবং যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদানের ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রুটি করা হইত না। বরং তাহাদের অভ্যর্থনা ও যত্ন-আর্তির এমন সুব্যবস্থা করিতেন, যাহা হইতে উত্তম কোন ব্যবস্থার কথা কল্পনাও করা যাইত না। এখানে একবার আসিবার পর কোন প্রকার দলীয় বা মাজহাবী বিদ্বেষের গন্ধও তাঁহাদের কেহ কোনদিন আবিষ্কার করিতে পারিতেন না।

রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি

১৯৪৪ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত রোগের তীব্রতা আরও বাড়িয়া গেল। মাওলানা তখন আর নামাজ পড়াইতে পারিতেন না। তবে দুইজনের কাঁধে ভর করিয়া জামাতে আসিয়া শামিল হইতেন এবং দাঁড়াইয়াই নামাজ আদায় করিতেন। এই সময় প্রায়ই বলিতেন, এই রোগ হইতে সারিয়া উঠিবার আর কোন বাহ্যিক লক্ষণ নাই, তবে আল্লাহর বিশেষ রহমত হইতে কখনও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। সমসাময়িক লোকদের প্রতি অভিযোগের সুরে বলিতেন, "বুনিয়াদি কাজ ছাড়িয়া সকলেই আংশিক কাজে মশগুল, গাছের ফুল-পাতা এবং ডালপালা নিয়া সকলেই ব্যস্ত, মূলের কথা কেহ চিন্তা করেন না, মৌলিক কাজ করিবার মত সময় যেন কাহারো হইয়া উঠে না।" এই সময়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুইটি ভাষণ দান করেন, এই ভাষণের প্রতিটি কথার মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, শেষ সময় আর বেশি দূরে নয় এবং এর মধ্যেও আল্লাহ পাকের কোন বৃহত্তর কল্যাণ নিহীত রহিয়াছে।

বিশিষ্ট উলামাগণের আগমন

সিন্ধু এলাকায় কার্যরত জামাতের মাধ্যমে প্রসিদ্ধ পীর হাফেজ মাওলানা হাশেমজান মোজাদ্দেদী সাহেব এই কাজের সঙ্গে পরিচিত হন এবং হযরত মাওলানার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। মার্চ মাসে তিনি দিল্লী চলিয়া আসেন। হযরত মাওলানা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহার আগমনে অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। যে সমস্ত লোককে আল্লাহ্ পাক বিশেষ কোন যোগ্যতা এবং মন-মস্তিষ্ক দান করিয়াছেন, এই ধরনের কোন লোক আসিয়া কাজে যোগ দিলে মাওলানার খুশীর আর সীমা থাকিত না। পীর হাশেমজান সাহেব ছিলেন হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানীর সাক্ষাৎ বংশধর। সেই দিক লক্ষ্য করিয়া হযরত মাওলানা তাঁহার সঙ্গে পীরজাদাদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রদর্শন করেন।

একই মাসে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর বড় ভাই ডাক্তার সৈয়দ আব্দুল গনী সাহেব সাক্ষাতলাভের উদ্দেশ্যে হাজির হইলেন। হযরত মাওলানা শায়িত অবস্থাতেই তাঁহার সঙ্গে মোয়ানাকা করিলেন এবং আন্তরিক খুশী প্রকাশ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, আপনার আগমনেই আমি আগের চাইতে অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছি। এই মারাত্মক অসুস্থতার সময়েও তবলীগী কাজের ব্যাপারে কোন সুসংবাদ আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মাওলানা অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিতেন। আনন্দের আতিশয্যে মুহূর্তের মধ্যে যেন তাঁহার চেহারা হইতে অসুস্থতার সকল ছাপ দূর হইয়া যাইত। উপরোক্ত দুইজন বিশিষ্ট মেহমানের মাধ্যমে মাওলানা দিল্লীর ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে কাজ করানোর আকাঁক্ষা প্রকাশ করিলেন– যাহারা তখনও পর্যন্ত কাজের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। মাওলানা তাঁহার লোকজনকে বার বার তাকিদ দিতে থাকিলেন যে, এই দুই বিশিষ্ট মেহমানের পরিচিত ও অনুরক্ত মহলে যেন ইহাদের দ্বারা তাহ্রিকের কিছু কাজ নেওয়া হয়। যে সমস্ত লোকের মধ্যে অন্য কাহারো দ্বারা কাজ নেওয়া সহজ নয় সেই সব ক্ষেত্রে যেন ইহাদের প্রভাব ও বিশেষ মর্যাদাটুকু তাহ্রিকের স্বার্থে কাজে লাগানো হয়। লোকজনকে ডাকিয়া বার বার বলিতেন– ডাক্তার সাহেবের সময় বরবাদ হইতেছে, তোমরা তাঁহার দ্বারা কাজ নিতেছ না কেন? কয়েকবার এই কথা বলিবার পর একবার ডাক্তার সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ "আমার বার বার বলিবার ফলে আপনি তো আবার মনে করিতেছেন না যে, সত্য সত্যই আপনার সময় নষ্ট হইয়া যাইতেছে।"

ডাক্তার সাহেবকে মেওয়াতের প্রবীণ কর্মীদের সঙ্গে থাকা এবং তাঁহাদের মধ্যেই সময় অতিবাহিত করিবার তাকিদ দিতেন। প্রথম আসিয়া তিনি একটি পৃথম কামরায় উঠিয়াছিলেন, কিন্তু মাওলানা এতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। বলিতে লাগিলেন ঃ এখানে আসিয়া যিনি মসজিদে অবস্থান করেন না তিনি কিন্তু নিজেকে পরিপূর্ণরূপে এখানকার আগন্তুক বলিয়া মনে করিতে পারেন না। এই কথা শুনিবার পর হইতে ডাক্তার সাহেব অধিকাংশ সময় মসজিদেই কাটাইতে লাগিলেন। পরে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, মসজিদের মধ্যে মেওয়াতীদের ভিতর অবস্থান করিবার ফলে তিনি অনেক বেশি ফায়দা লাভ করিয়াছেন, নিজের মধ্যে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন অনুভব করিয়াছেন।

মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ এই কাজে কিভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে পারেন এই ব্যাপারে একটা সুষ্ঠু কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য হযরত মাওলানা একটি বৈঠক আহবান করিবার জন্য তাগিদ দিলেন। তাঁহার আহবানেই দারুল-উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার মোহতামেম হযরত মাওলানা ক্বারী মুহম্মদ তৈয়্যব সাহেব, হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ্ সাহেব (রাহঃ), হযরত মাওলানা মুহম্মদ শফী সাহেব (রাহঃ), মাজাহেরুল উলুম সাহারানপুরের মোহতামেম হযরত মাওলানা হাফেজ আব্দুল লতীফ সাহেব, দেওবন্দের শায়খুল আদব হযরত মাওলানা এজাজ আলী সাহেব এবং শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব প্রমুখ উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় উলামা-বুজুর্গগণ এই পরামর্শ সভায় শরীক হইলেন। হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরীও নিজামুদ্দিন তশরিফ নিয়া আসিলেন। মার্চ মাসের শেষভাগে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর এই মোবারক এজতেমা শেষ হইল।

সিন্ধুর উদ্দেশ্যে ৩য় জামাত

এপ্রিল মাসের প্রথমভাগে হাফেজ মকবুল হাসান সাহেবের নেতৃত্বে ষাট-সত্তর জনের একটি জামাত সিন্ধুপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া গেল। জামাতের প্রথম মনজিল ছিল লাহোরে। এখানে দুইদিন অপেক্ষা করিয়া কিছু কাজ করা হইল। জামাত লাহোর পৌছিবার দ্বিতীয় দিবসে পীর হাশেমজান সাহেব আসিয়া যোগ দিলেন। কাবুলের প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা হযরত নূরুল মাশায়েখ সাহেব তখন লাহোরে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন পীর হাশেমজান সাহেবের নেতৃত্বে কয়েকজন গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

মাওলানা সৈয়দ রেজা হাসান সাহেব হযরত নূরুল মাশায়েখের খেদমতে জামাতের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচিতি পেশ করেন।

পেশোয়ারের জামাত

হযরত মাওলানার এই বৈপ্লবিক তাহ্‌রিক সম্পর্কে পেশোয়ারের লোকজন অবহিত হইয়া এপ্রিল মাসেই কয়েকজনের একটি জামাত দিল্লীতে আসিয়া মাওলানার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই সংকল্পের কথা হযরত মাওলানাকে লিখিয়া জানাইলেন। পত্রে তাঁহারা উল্লেখ করিলেন যে- আপনার অস্তিত্ব এবং স্বাস্থ্য ইসলাম ও মুসলমানদের এক অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদ আরও কিছুকাল স্থায়ী হওয়ার জন্য আপনি নিজেও আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন। মাওলানার তরফ হইতে এই পত্রের জবাবে লেখা হইল ঃ

> এপ্রিল মাসে জামাতের আগমন শুভ হউক। তবে মুনাছেব মনে হয় জামাত এখানে আসার আগে যদি কিছুদিন পেশোয়ারের লোকজন আপনার পরিচালনায় নিয়ম মাফিক কিছুদিন কাজ করে এবং কাজের মাধ্যমে তাহ্‌রিকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়, তবেই জামাত এখানে আসিলে অনেক বেশি ফয়দা হওয়ার সম্ভাবনা। সেমতে নির্ধারিত সময়ের আগেই আপনার নেগরানীতে স্থানীয়ভাবে জামাতের দ্বারা কিছু কাজ করাইয়া নিন।
>
> নিজের স্বাস্থ্যের জন্য আমি অবশ্যই দোয়া করিতেছি, তবে এই শর্তে- যেন আমি আমার নির্ধারিত সবগুলি কাজ যথারীতি করিয়া যাইতে পারি এবং কোন একটি মুহূর্তও যেন বেহুদা কাজে ব্যয়ীত না হয়। আমার বর্তমান অবস্থা হইতেছে, যে কাজ আমার হস্তক্ষেপ ব্যতীত হওয়া সম্ভব নয়, শুধু ততটুকুতেই আমি অংশগ্রহণ করিতেছি। অবশিষ্ট সকল কাজ এখন জামাতের জিম্মায়, অসুস্থতার মধ্যে আমি এই নতুন শিক্ষাটি গ্রহণ করিয়াছি। (১৪ মার্চ, ১৯৪৪ সন)

হযরত মাওলানার নির্দেশ মোতাবেক প্রাথমিক কিছু কাজ করিবার পর পেশোয়ারের একটি ক্ষুদ্র জামাত ৮ই এপ্রিল তারিখে পেশোয়ার হইতে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল। এই জামাতের আরশাদ সাহেব, মাওলানা এহ্‌সানুল্লাহ নদভী; মিস্ত্রী আব্দুল কুদ্দুস সাহেব এবং দুইজন অল্পবয়স্ক বালক শরিক ছিল।

নিজামুদ্দিনের কার্যধারা

পেশোয়ার হইতে আগত জামাতের অন্যতম সদস্য সুলেখক আরশাদ সাহেব জামাতের সকল কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহা আজ মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হইয়াছে। উহারই কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে। এর দ্বারা তখনকার দিনের নিজামুদ্দিনের দৈনন্দিন কার্যধারা এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইবে। আরশাদ সাহেব লিখিয়াছেন ঃ

বেলা একটার সময় একজন অল্পবয়স্ক বালক আসিয়া খবর দিল যে, খানা পরিবেশন করা হইয়াছে। মসজিদের এক কোণে মাওলানার হুজরা। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, খানা দেওয়া হইয়াছে এবং হুজরার এক কোণে একটি চারপায়ীর উপর লেপ গায়ে দিয়া কয়েকটি তাকিয়ায় হেলান দেওয়া অবস্থায় হযরতজী বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে রোগীর পথ্য দেওয়া হইয়াছিল; চেহারায় যেন নূরের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তবে শরীরে সামান্য অস্থিচর্ম ব্যতীত আর কিছু ছিল না। চারপায়ীর পাশেই ফরাশে তাঁহার চিকিৎসক বসিয়াছিলেন। আমরা সালাম আরজ করিয়া খাইতে বসিয়া গেলাম। অনুমান বিশ-ত্রিশ জনে খানা খাইতেছিলাম। খানার সময় হযরতজীকে আমরা বলিতে শুনিলাম-

> হাকীম সাহেব! আমি তো আপনার সকল বিধিনিষেধ শরিয়তের হুকুমের ন্যায় গুরুত্ব সহকারে পালন করিতেছি। আপনার নির্দেশেই দাঁড়াইয়া নামাজ পড়ার সীমাহীন সওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকিতেছি। এটা কি কম কথা?
>
> ভাইসব! বান্দার প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ সম্পর্ক থাকে। এমন কি কাফেরের সঙ্গেও এই সম্পর্ক বজায় থাকে। এই সম্পর্কের প্রমাণ হিসাবেই তো আল্লাহ্ পাক কোরআন মজীদে হযরত ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে আমি মৎসের গ্রাসে পরিণত করিলাম এই জন্য যে, "তাঁহার প্রতি ভৎর্সনা করা হইয়াছিল।" শেষের ভৎর্সনা শব্দটির উপর হযরত বেশি জোর দিলেন এবং বলিলেন, এই ভৎর্সনা তো কাফেরদের পক্ষ হইতেই করা হইয়াছিল।

এখন চিন্তা করিয়া দেখ, কাফেরদের সঙ্গেও যদি আল্লাহ্ পাকের এমন সম্পর্ক থাকিতে পারে, তবে মুমেনগণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কতটুকু গভীর। ভাইসব! "মুমেনের খেদমতই হইতেছে বান্দার প্রকৃত মকাম। বন্দেগী কি! মুমেনের ইজ্জতের খাতিরে যে কোন গঞ্জনা অকাতরে সহ্য করিবার মর্যাদা হাসিল করা। আমাদের তাহ্রিকের সর্বাপেক্ষা বুনিয়াদি উসুল হইতেছে এইটাই। আর ইহা এমন একটি উসুল, যা কোন প্রাজ্ঞ আলেম, আলেম সমাজের অনুসারী সাধারণ মানুষ বা জড়বাদি কোন লোকই অস্বীকার করিতে পারিবে না।" এরপর হযরত মাওলানা অহংকার এবং রিয়া বা লোক দেখানো কাজের নিন্দা করিয়া মজলিস ভঙ্গ করিয়া দিলেন।

জোহরের সময় দুইজন লোকে ধরাধরি করিয়া হযরতজীকে মসজিদে নিয়া আসিল এবং মিম্বরে বসাইয়া দেওয়া হইল। মিম্বরে হেলান দিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন;

(ক) "ভাইসব! আমরা রসূলে-খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো রাস্তা হইতে শুধু সরিয়াই আসি নাই, অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছি। রাষ্ট্রক্ষমতা বা অন্য কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করা মুসলমানদের একমাত্র উদ্দেশ্য কখনও হইতে পারে না। রসূলে করীমের (সঃ) পথে চলিতে চলিতে যদি রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ হইয়া যায় তবে তাহা হইতেও আমাদিগকে সরিয়া আসিলে চলিবে না। তবে ইহা আমাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কখনই নয়। একমাত্র আল্লাহর রাসূলের পথেই আমাদের সবকিছু এমন কি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে হইবে।"

(খ) "দ্বিতীয় একটি কথা স্মরণ রাখিও। মুসলমানদের মধ্যে যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রবেশ করিয়াছে সেই দোষগুলি বেশি বর্ণনা করিয়া তার প্রতিকার করা যাইবে না। বরং এখনও মুসলমানদের মধ্যে যেটুকু ভাল গুণ দেখা যায়, সেইগুলির বেশি উল্লেখ করা উচিত। এতে করিয়াই মন্দগুলি আপনা হইতেই বিদুরিত হইয়া যাইবে।"

এরপর নামাজ শুরু হইল। আগের মতই দুইজন লোক আসিয়া হযরতজীকে নামাজের কাতারে দাঁড় করাইয়া দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়; যেলোক দুইজনের সাহায্য ব্যতীত একটু নড়াচড়াও করিতে পারেন না, তিনিই নামাজের চারিটি রাকাতের রুকু-সেজদা-কেয়াম সবকিছু অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে নেহায়েত নিমগ্নতার সঙ্গে আদায় করিলেন।

নামাজের পর তিনি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ! তোমরা বসিয়া বসিয়া সময় নষ্ট করিবার জন্য এখানে আস নাই। একটি মুহূর্তও বেকার যাইতে দিও না। অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য তোমরা আসিয়াছ। এই সামান্য সময় তো কিছুই নয়।" অতঃপর অত্যন্ত মোলায়েম সুরে বলিতে লাগিলেন, "ভাই! এরপর বড় এক জামাত নিয়া আসিও এবং দীর্ঘ সময় এখানে কাটাইয়া যাইও। এখানে বেশি সময় অবস্থান করা প্রয়োজন।"

অতঃপর মাওলানাকে দুইজন লোক ধরাধরি করিয়া হুজরার মধ্যে নিয়া গেলেন। মসজিদে সমবেত লোকজনকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হইল। যাহারা আরবি জানেন. তাহাদিগকে একদিকে বসাইয়া কিতাবুল ঈমানের হাদীস পড়িয়া শোনানো হইল। আর যাহারা আরবি জানেন না, তাহাদিগকে অন্য একস্থানে সমবেত করিয়া তাহ্রিক সম্পর্কিত উর্দু কিতাব পড়িয়া শোনানো হইল। পড়িবার পর পারস্পরিক আলোচনা চলিল। জানা গেল, এখানে যাহারা অবস্থান করেন তাঁহাদের পক্ষে একটি নির্দিষ্ট নেসাবের পাঠ এইভাবে গ্রহণ করিতে হয়।

রাতের বেলায় পেশোয়ারের জামাত অন্য একটি জামাতের সঙ্গে মিলিত হইয়া পাহাড়গঞ্জ এলাকায় তবলীগের কাজ করিতে চলিয়া গেল এবং রাত্রি সেইখানেই কাটাইয়া আসিতে হইল।

দ্বিপ্রহরের সময় অত্যন্ত চমৎকারভাবে হাদীসের দরস হইল। চায়ের সময় হযরতজীর তবিয়ত অনেকটা ভাল বলিয়া মনে হইতেছিল। আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ "ভাই! বড় বড় জামাত তৈরী করিয়া পাঠাও। দুনিয়ার কোন কাজই অনুশীলন ব্যতীত শিক্ষা করা যায় না। এমনকি অনুশীলন ব্যতীত চুরি করিতে গেলেও ধরা পড়িতে হয়। সুতরাং তবলীগের ন্যায় এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ শিক্ষা করা ব্যতীত কি করিয়া রপ্ত হইবে?"

অতঃপর অত্যন্ত মোলায়েম সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাই! জামাত নিয়া আসিবে না।"

আমি নিবেদন করিলাম– "হযরত! যদি এইখান হইতে একটা জামাত পেশোয়ারে সফর করে তবে ইনশাআল্লাহ্ সেখানকার লোক সহজেই এই কাজের প্রতি আকৃষ্ট হইবে।"

হযরতজী জবাব দিলেন– তুমি এক কাজ কর, পত্র লেখ এবং সেখানকার প্রভাবশালী লোকদের দ্বারা লেখাও। যাহারা এখনো পর্যন্ত তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করিতেছেন, সেই সমস্ত আলেমগণ নিশ্চয়ই তোমাদের তাকিদে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে

নামিয়া আসিবেন।

অদ্য জোহরের নামাজের পর হযরতজী তবলীগী জামাতগুলির গঠনপ্রণালী এবং তাহাদিগকে কাজে রওয়ানা করা বিষয়ে হেদায়েত দিতেছিলেন।

জোহরের পর হাদীস শরীফের দরসে মাওলানা ওয়াসেফ কিতাবুল জেহাদের অত্যন্ত আকর্ষণীয় কয়েকটি হাদীস শুনাইলেন।

হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়ার ওরশ এবং মেলা উপলক্ষে আজ মসজিদে অনেক লোক সমাগম হইয়াছে। সমবেত এই সমস্ত লোকের মধ্যে তবলীগের কাজ জোরে-সোরে চলিতে লাগিল।

বৈকাল পাঁচটার সময় নিয়মিত তবলীগী জামাতসমূহ রওয়ানা হইয়া গেল।

১২ই এপ্রিল, ১৯৪৪ সন। সকালে চা খাওয়ার সময় হযরতজী এরশাদ করিলেন– আগের যুগের নবীগণ যেভাবে শরিয়ত নিয়া আবির্ভূত হইতেন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অনুরূপভাবে শরিয়তসহ আগমন করিয়াছেন। হযরত ঈসার (আঃ) ইঞ্জিল পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে বাতিল করে নাই, বরং তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিয়াছে মাত্র। কিন্তু রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে বাতিল করিয়া দিয়াছে। সুতরাং এখন পূর্ববর্তী যে কোন কিতাবের সরাসরি অনুসরণ করা হারাম।

যে বিষয়ে অন্যান্য নবীগণের তুলনায় আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তাহা হইতেছে তবলীগের পদ্ধতি। পূর্ববর্তী নবীগণের সময় নব্যুয়তের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। এক নবীর পর আর এক নবী আসিতেন। এইজন্য আমাদের নবী (সঃ) তবলীগের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সময়ে সেইরূপ কোন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কেননা, তাঁহার পর নব্যুয়তের ধারাবাহিকতা শেষ হইয়া গিয়াছে। ফলে তবলীগের সকল দায়িত্ব তাঁহার উম্মতের উপর আসিয়া পতিত হইয়াছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে জামাতবদ্ধভাবে দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিতেন। তবলীগের সেই পদ্ধতি পূণর্জীবিত করিবার প্রয়োজন এখন অত্যন্ত বেশি।

অতঃপর হযরত মাওলানা, "সৃষ্টিকর্তার নাফরমানি করিয়া কোন সৃষ্টের আনুগত্য চলে না"– এই হাদীস সম্পর্কে আলোচনা শুরু করিলেন। বলিলেন– "দুনিয়ার মোয়ামেলা এমন কি পিতা-মাতা, উস্তাদ-পীর সকল ক্ষেত্রেই

আনুগত্যের মাপকাঠি হিসাবে এই হাদীসের প্রতি নজর রাখিতে হইবে।"

এরপর মাওলানা এহসানুল্লাহ্ সাহেবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন– বুঝলে মৌলবী সাহেব! এই কাজ ইসলামের প্রথম যুগের উত্তরাধিকার। এরজন্য জীবন কুরবান করিয়া দাও, নিজের সবকিছু লুটাইয়া দাও। এরজন্য যতবেশি কুরবানী করিবে, ততবেশি ফল পাইবে।"

যেসব কথা শুনিয়া তোমরা আজ আনন্দলাভ করিতেছ, এইসব কিছুই অপরের বাগানের ফল-ফুলের ন্যায়। অন্যের ফল দেখিয়া খুশী হইয়া লাভ নাই।

এই কাজের মাধ্যমে নিজের বাগানে ফল উৎপাদন করিতে শুরু কর। এই জিনিস কঠোর সাধনা এবং ত্যাগ ব্যতীত তৈরী হইতে পারে না।

আসরের সময় মোষলধারে বৃষ্টি হইতে শুরু করিল। তাই আজ তবলীগের নিয়মিত কার্যক্রম মুলতবী রাখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নামাজের সময় হযরতজী বাহিরে আসিয়া জামাত গাশ্তে না যাওয়ার কারণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। মেওয়াতীদের ত্যাগ এবং ঈমানের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন– এইসব লোকের নিকট তোমরা ঋণী হইয়া রহিয়াছ। ইহারাই তোমাদিগকে সহীহ্ রাস্তা দেখাইয়াছে।

অতঃপর একজন গরীব মেওয়াতীকে ডাকিয়া আনিয়া পাশে বসাইলেন। তাহাকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, প্রথম প্রথম যখন ইহাকে আমি বলিয়াছিলাম যে– যাও, তবলীগের কাজ কর। তখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তবলীগ" আবার কি? আমি বলিলাম, তুমি লোককে গিয়া কলেমা শিক্ষা দাও। সে বলিল, হযরত! আমি নিজেই তো কলেমা জানি না। আমি বলিলাম, যাও লোকজনকে ডাকিয়া এই কথাটাই বলিয়া আস যে– দেখ ভাইসব ! আমার এত বয়স হইয়া গিয়াছে, শিক্ষা না করিবার কারণে এখনও আমি কলেমাটাও উচ্চারণ করিতে পারি না। "ভাইসব! তোমরা কাহারও নিকট গিয়া কলেমা অবশ্যই শিক্ষা কর ।"

মাওলানার তকরিরের ফলে আসরের নামাজের পর প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেই গাশ্ত করিবার উদ্দেশ্য জামাত রওয়ানা হইয়া গেল। আল্লাহর শান দেখুন! জামাত রাস্তায় বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি বন্ধ হইয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। আধা মাইল দূরবর্তী একটা গ্রামে মাওলানা ওয়াসেফ সাহেবের নেতৃত্বে তবলীগ শুরু হইল এবং মাগরিব বাদ জামাত ফিরিয়া আসিল। এখানে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে দিল্লীর অনেক বিশিষ্ট লোক মাওলানার সঙ্গে

সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসিয়া সমবেত হন। আজ বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এখানে খুবই জমজমাট অবস্থা । বেশ কিছুসংখ্যক পবিত্র চেহারাও নজরে পড়িল। তাহাজ্জুদের সময় অধিকাংশ লোককে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র জিকিরে মশগুল দেখতে পাইলাম। হযরত মাওলানার নির্দেশে আজ ফজরের নামায আমাদের সঙ্গী মাওলানা এহ্সানুল্লাহ্ পড়াইলেন। সকালের চায়ের সময় পঞ্চাশ-ষাটজন সমবেত ছিলেন। হযরত মাওলানা বলিতে লাগিলেন ঃ

(ক) নামাযের মধ্যে একটি ছোট সূরা যথা– সূরায়ে ফাতেহা পড়ার যে সওয়াব, নামাযের বাহিরে সমগ্র কোরআন শরীফ খতম করিয়া সেই পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায় না। সুতরাং যে জামাত মানুষকে নামায পড়িতে উৎসাহিত করিবার জন্য কাজ করে, তাদের সেই কাজের কি পরিমাণ সওয়াব, তার পরিমাণ কে করিতে পারিবে?

স্থান-কালের গুণে সব কাজের মধ্যেই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। তেমন দ্বীন প্রচারের জেহাদে লিপ্ত থাকা অবস্থায় জিকির করাতে যে ফায়দা হয়, ঘরে বসিয়া বা খানকায় আবদ্ধ থাকিয়া জিকির করিবার চাইতে তাহা নিঃসন্দেহে অনেকগুণ বেশি । সুতরাং "বন্ধুগণ! কাজের মধ্যে ও সর্ববস্থায় বেশি করিয়া জিকির করিতে থাকিও।"

(খ) আমার এই তাহ্রিক আল্লাহর নির্দেশ, "আল্লাহর পথে সুসজ্জিত অবস্থায় অথবা রিক্ত হস্তে হইলেও বাহির হইয়া পড়" বাস্তবায়িত করা ব্যতীত আর কিছু নয়। এই অভিযানে কোন ত্রুটি করা আল্লাহর আজাবকে ডাকিয়া আনার নামান্তর মাত্র। বন্ধুগণ! তবলীগের এই কাজে উছুলের পাবন্দী করা অত্যন্ত জরুরী । যদি কাজের মধ্যে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম কর, তবে আল্লাহর যে আজাব হয়ত পরে আসিত তা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তোমাদিগকে ঘিরিয়া ধরিবে। এই তাহ্রিকের ইতিহাসে অনুরূপ দুইটি ঘটনা ঘটিয়াছে। একবার দৃশ্যতঃ আন্দোলন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিবার পর উছুলের ব্যতিক্রম ঘটিবার কারণে হঠাৎ অনেক নিচে নামিয়া যায়। সুতরাং "ভাইসব! ছয়-উছুলের অনুসরণে অত্যন্ত দৃঢ় থাকিও।"

(গ) ইসলাম কি? "আল্লাহর নির্দেশের প্রতি মাথা পাতিয়া দেওয়া ব্যতীত আর কিছু নয়। শয়তান আমাদিগকে সেই পাবন্দি হইতে বিরত রাখে। শয়তান আমাদের চোখের সামনে দুই ধরনের পর্দা ফেলিয়া দেয়। একটি হইল, অন্ধকারের পর্দা। অর্থাৎ নফসকে মন্দকাজের প্রতি প্রলুব্ধ করিয়া দেয়। দ্বিতীয়

প্রকার হইল নূরানী পর্দা। এই পর্দার অর্থ হইল, শয়তান কৌশলে উত্তম কাজ হইতে সরাইয়া আনিয়া কম গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে লাগাইয়া দেয়। ফরজের সময়ে নফল কাজে লিপ্ত করিয়া রাখে এবং নফস মনে করিতে থাকে যে, আমি তো ভাল কাজই করিতেছি। আজকের দিনের সর্বাপেক্ষা বড় দায়িত্ব হইতেছে তবলীগের কাজ। অনেক বড় বড় ইবাদতও এই কাজের পরিপূরক হইতে পারে না।"

চা-নাশ্তার পর সিদ্ধান্ত হইল, পেশোয়ারের জামাত দিল্লীর জামাতের সহিত শামিল হইয়া তবলীগের উদ্দেশ্যে আগামীদিন সকালেই সাহারানপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া যাইবে। নির্ধারিত সময়ে আমরা হযরতজীর নিকট বিদায় নিতে আসিলাম। বাচ্চা দুইটি সঙ্গে ছিল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, বাচ্চাদের নিয়া আসিলে না কেন? আমরা উজর পেশ করিলাম। শুনিয়া বলিলেন,–ভাই! তোমরা নিজেরা তো শিশুদের বুঝানোর ব্যাপারে অপারগ, আর এই অপারগতা ঢাকা দেওয়ার জন্য অবুঝ বলিয়া বাচ্চাদের দোষ দাও। শিশুদের পক্ষে কোন কিছু বুঝিবার দরকার কর না। তাহাদের কানে ভাল ভাল কথা ফেলিতে থাকা, দেখাইতে থাকা এবং অনুভব করাইতে থাকাই আসল কাজ। যদি এর দ্বারা কোন কাজ না হইত, তবে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুদের কানে আজান দেওয়ার নির্দেশ আসিল কেন?

অতঃপর অত্যন্ত জোরের সঙ্গে আমাদিগকে সর্বদা জিকিরে মশগুল থাকিবার উপদেশ দিলেন। বলিলেন, জিকির হইল বর্মের ন্যায়। এর ফলে শয়তান তোমাদের উপর হামলা করিতে বা বিজয়ী হইতে সমর্থ হইবে না। আল্লাহ বলিয়াছেন– "স্মরণ রাখিও, একমাত্র আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেই অন্তরে শান্তি লাভ হওয়া সম্ভব।"

"ভাইসব! তোমাদের শিশুদিগকে সব সময় ভাল ভাল কথা শুনাইতে থাকিও।"

বিদায়ের মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত মাওলানা আমাদিগকে জিকিরের তাকিদ এবং ফজীলত বর্ণনা করিতে থাকিলেন।

সাহারানপুরে মৌলবী আব্দুল গাফফার নদভীর যবানী– হযরত মাওলানা পেশোয়ারের জামাতের জন্য বিশেষ পয়গাম পাঠাইলেন– "তোমরা মাত্র কয়েকদিনের জন্য আসিয়া আরাম করিয়া চলিয়া গেলে। মনে রাখিও, এই পথে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার তক্লীফ বরদাশ্ত করিবার প্রয়োজন আছে। এই পথে ঘাম বহাও এবং প্রয়োজনের সময় রক্ত ঢালিয়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।"

দাওয়াতের কাজে একাগ্রতা

কঠিন পীড়ার এই দিনগুলিতেও হযরত মাওলানা তাঁহার দাওয়াতের কাজে কতটুকু একাগ্রতা রাখিতেন, মাসিক আল ফুরকান পত্রিকার সম্পাদক প্রখ্যাত মনীষী মাওলানা মনযুর নোমানী সাহেবের বর্ণনা করা তৎসম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা তাঁহারই সম্পাদিত পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহের দিকে হযরত আতাউল্লাশাহ্ বোখারী হযরতজীকে দেখিতে আসিলেন। এর মাত্র দুইদিন আগেই তাঁহার পীড়ার তীব্রতা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। যার ফলে তিনি এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, দুই-চারি মিনিট কথা বলিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না। শাহ্ সাহেবের আগমন সংবাদ শুনার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডাকাইলেন। বলিলেন, ইহার সহিত আমাকে জরুরী কথা বলিতে হইবে। তুমি আমার মুখের কাছে কান পাতিয়া রাখিবে, আমি যা কিছু বলিব তা তাঁহাকে বলিয়া যাইবে।

হযরত শাহ্ সাহেব নিকটে আসিবার পর হযরত মাওলানা প্রথমে অবশ্য আমার মাধ্যমে কথা বলিতে শুরু করিলেন, কিন্তু কয়েক মিনিট যাইতে না যাইতেই যবানের মধ্যে এমন শক্তি আসিয়া গেল যে, সরাসরি আধঘন্টারও বেশি সময় কথা বলিতে থাকিলেন।

এপ্রিল মাসেই তাঁহার রোগের প্রকোপ এত বাড়িয়া গেল যে, একদিন দুই ঘন্টা পর্যন্ত বেহুশ হইয়া রহিলেন। চক্ষু মুদিয়া আসিল। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর চোখ খুলিয়া গেল। যবান হইতে বাহির হইতে লাগিল ঃ...........

সত্য জয়ী হইবে! সত্য জয়ী হইবে!! সত্য জয়ী হইবে– কখনও পরাজিত হইবে না!!!

অতঃপর কিছুক্ষণ কেমন যেন অভিভূত হইয়া গেলেন। পবিত্র যবান হইতে মধুর সূরে কোরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত হইতে শুনা গেল ঃ

অর্থাৎ– "মুমিনগণকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।"

লেহানের সঙ্গে কোরআন শরীফ পাঠ করা হযরত মাওলানার সাধারণ অভ্যাস ছিল না। এই অবস্থায় যখন তাঁহার মুখ হইতে বেশ বুলন্দ আওয়াজে

সুমিষ্ট লেহানে কোরআনের উপরোক্ত আয়াতটি উচ্চারিত হইতেছিল, তখন আমি হুজরার বাহিরে মসজিদের ছেহেনে অবস্থান করিতেছিলাম। ভিতরে যে খাছ খাদেম ছিলেন তাঁহাকে আমার নাম ধরিয়া বলিতে লাগিলেন– সে কোথায়, ডাকিয়া আন। শুনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি হুজরার ভিতরে চলিয়া গেলাম। আমাকে দেখিয়াই বলিতে লাগিলেন– "মৌলবী সাহেব, আল্লাহর ওয়াদা হইতেছে, এই কাজ অবশ্যই কামিয়াব হইবে। আল্লাহর অব্যাহত সাহায্য এই কাজকে শেষ মনজিল তক পৌছাইবে। তবে শর্ত হইল– তাঁহার ওয়াদা এবং সাহায্যের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রাখিয়া তাঁহারই নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতে থাক। তোমাদের সাধ্যমত যেকোন চেষ্টা হইতে বিরত হইও না।"

কথাগুলি বলার পরই চক্ষু পুনরায় বন্ধ হইয়া গেল। অল্প কিছুক্ষণ গভীর নিরবতার পর পুনরায় শুধু এই কথা কয়টি বলিলেন ঃ

হায়! যদি উলামাগণ এই কাজের দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার পর আমি বিদায় হইতাম!'

সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় হইল, রোগের তীব্রতা এবং শারীরিক দুর্বলতা যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল, তাঁহার মধ্যে যেন আল্লাহর দ্বীনের পুনর্জাগরণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভাবনা ততই তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল।

কঠিন অসুখে কাতর হইয়া মাসের পর মাস বিছানায় পড়িয়া থাকিবার ফলে হযরত মাওলানা এমন শোচনীয়ভাবে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কোন লোকের পক্ষে এই অবস্থায় সম্পূর্ণ মুখ বন্ধ করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকা ছাড়া মুখ দিয়া একটু শব্দ বাহির করাও হয়ত সম্ভবপর হইত না। কিন্তু এই মারাত্মক ব্যাধির অবস্থাতেও যখনই তাঁহাকে দেখিয়াছি, তিনটি অবস্থার কোন না কোন এক অবস্থাতে তিনি নিমগ্ন রহিয়াছেন ঃ

(এক) ইসলামের পুনর্জাগরণের চিন্তায় ডুবিয়া রহিয়াছেন।

(দুই) অথবা এর জন্য হৃদয়ের গভীর আকুতি সহকারে দোয়া করিতেছেন। যাহারা কাজ করিতেছেন তাঁহাদের নিষ্ঠা, দৃঢ়তা এবং রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরিকার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা ও এই কাজ কবুল করিবার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়ার হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এমন আবেগের সঙ্গে দোয়া করিতেছেন যে, পাশে যাহারা থাকিত তাহাদের পক্ষে ক্রন্দনবেগ সম্বরণ করা সম্ভব হইত না।

(তিন) অথবা কাজের জন্য জরুরী উপদেশ-নির্দেশ প্রদান করিতেছেন।

এমনকি চিকিৎসা করিবার জন্য যে সমস্ত ডাক্তার-কবিরাজ আসিতেন, তাঁহাদিগকেও প্রথমে কাজের দাওয়াত দিতেন, তারপর তাহাকে দেখার সুযোগ দিতেন। একদিন মুফতী কেফায়েতুল্লাহ্ সাহেব দিল্লীর জনৈক বিখ্যাত ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়া আসিলেন। হযরত মাওলানা সেই ডাক্তারের সম্মুখে কি চমৎকার-ভাবেই না তাঁহার নিজের কথা বলিয়া গেলেন।

ডাক্তার সাহেব! আপনার আয়ত্তে এমন একটি বিদ্যা রহিয়াছে যাদ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। কিন্তু এই বিদ্যাকেও ম্লান করিয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে অন্ধের দৃষ্টিদান, কুষ্ঠরোগীর আরোগ্য সাধন এমন কি মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিবার ন্যায় কয়েকটি বাহ্যিক মোজেযা দান করিয়াছিলেন। হযরত ঈসাকে (আঃ) যে রূহানী শক্তি দান করা হইয়াছিল, তা নিঃসন্দেহে এই সমস্ত বাহ্যিক মোজেযার তুলনায় ছিল অনেকগুণ বেশি শক্তিশালী।

এখন আপনার প্রতি আমার বক্তব্য হইল, "আমাদের হযরত খাতামুল-আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক যে রূহানী এলেম এবং আহকাম প্রেরণ করিয়াছেন তাহা হযরত ঈসার (সাঃ) এত শক্তিশালী রূহানী শক্তি ও জাহেরী মোজেযাকে পর্যন্ত অচল করিয়া দিয়াছে। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, হুজুরের (সাঃ) মাধ্যমে পাওয়া ঐ সমস্ত রূহানী বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার ফলে কতবড় মহান জিনিসের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইয়াছে। লোকজনকে আমরা শুধু এই কথাই বলিয়া থাকি যে, তাহারা যেন এই অমূল্য নেয়ামতের দ্বারা ফায়দা হাসিল করে, অন্যথায় খুবই নিদারুণ বঞ্চনার সম্মুখীন হইতে হইবে।"

দ্বীন পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয় ছাড়া অন্য কোন কথা মুখে উচ্চারণ করা তো দূরের কথা, কানে শোনাও পছন্দ করিতেন না। কেহ সম্মুখে অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তা সহ্য করিতে পারিতেন না। সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ করিয়া দিতেন। খাদেমদের মধ্যে কেহ্ কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিতেন ঃ

> ভাই! সুস্থতা-অসুস্থতা তো মানুষের সঙ্গে সব সময়ই লাগিয়া রহিয়াছে। এর মধ্যে আবার ভাল বা মন্দের কি থাকিতে পারে? কুশল-মঙ্গল তো তখন হইবে– যখন আল্লাহ্ পাক যে কাজের জন্য পয়দা করিয়াছেন তা ঠিকমত আদায় হয় এবং এর দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রুহ্ শান্তিলাভ করে।
>
> "সাহাবায়ে-কেরামকে হুজুর (সাঃ) যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তার মধ্যে সামান্য একটু অন্যথা হইলেই উহাকে তাঁহারা বিরাট অমঙ্গল বলিয়া জ্ঞান করিতেন।"

হাজী আব্দুর রহমান সাহেব বর্ণনা করেন, অসুস্থতার সময় কান্দালা হইতে হযরত মাওলানার কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। মাওলানা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ? তাঁহারা আরজ করিলেন, আপনার কুশলবার্তা জানিবার জন্য। বলিলেন, "যে মিটিয়া যাওয়ার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কুশলবার্তা জানবার জন্য কান্দালা হইতে এই পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছ, আর রসূলে-খোদার (সাঃ) প্রিয় দ্বীন যা মিটিবার নয় অথচ মিটিয়া যাইতে বসিয়াছে আর তোমরা তার কোন খবরই রাখ না।"

এক জুমার দিনে ফজরের নামাজ মাওলানা ইউসুফ সাহেব পড়াইলেন এবং কুনুতে-নাজেলা পড়িলেন। উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় জীবনে কোন দুর্যোগ দেখা দিলে তাহা হইতে উদ্ধারপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার জন্য ফজরের নামাজের মধ্যে বিশেষ এক পদ্ধতিতে কুনুতে-নাজেলার দোয়া পড়িবার নিয়ম রহিয়াছে।

নামাজ শেষ হওয়ার পর একজন মেওয়াতী খাদেম মাওলানা ইউসুফ সাহেবকে আসিয়া বলিলেন যে, হযরতজী স্মরণ করিয়াছেন। খেদমতে হাজির হওয়ার পর হযরত মাওলানা বলিলেন– কুনুতে-নাজেলা পাঠ করিবার সময় ইসলামের অন্যান্য দুশমনের কথা স্মরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত অ-মুসলিম যোগী এবং তান্ত্রিক ইসলামের বিরুদ্ধে তাহাদের আত্মীক শক্তি নিয়োজিত করিয়া থাকে, তাহাদের কথাও স্মরণ করা দরকার। এই কথার দ্বারা হযরত মাওলানা কিছুদিন আগেই সাহারানপুরে অনুষ্ঠিত অর্যসমাজী বনাম মুসলমানদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি তর্কযুদ্ধের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করিতেছিলেন। সেই তর্কের সময় জনৈক হিন্দু তান্ত্রিক তাহার আত্মীক শক্তির সাহায্যে মুসলমান তার্কিকের বাক-স্ফুরণে বার বার বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়া এক সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রাহঃ) এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি সেই দিকে একটু লক্ষ্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ন্যাসী আতঙ্কিত হইয়া সভাস্থল ছাড়িয়া গেল। এরপরই দেখা গেল, মুসলমানদের পক্ষীয় তার্কিকের স্বাভাবিক বাকপটুতা

ফিরিয়া আসিয়াছে। – (তাযফেরাতুল খলীল)

সেই দিন ফজর নামাজ বাদ মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী এবং মাওলানা মনযুর নোমানী মসজিদে সংক্ষিপ্ত তকরির করিলেন। হযরত মাওলানার অবস্থা সংকটজনক হইয়া পড়ায় এবং এই কথা স্মরণ করিয়া যে, মাত্র কয়েকদিন আগেও হযরত মাওলানা নিয়মিতভাবে এই মিম্বরে বসিয়া তকরির করিতেন, লোকজনের অন্তর বেদনা-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ মাওলানা মনযুর নোমানী যখন এক সময় বলিয়া ফেলিলেন যে, আল্লাহ এই মেহরাব ও মিম্বরকে আবাদ রাখুন, আপনারা অনেক বারই এই মিম্বর হইতেই হযরত মাওলানার পবিত্র মুখ নিসৃত এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছেন..............। তখন হাজেরানের সকলেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

দীর্ঘদিনের দস্তর ছিল জুমার রাত্রিতে হযরত মাওলানা মসজিদে সমবেত লোকজনের সম্মুখে তবলীগ সম্পর্কে নিয়মিত ভাষণদান করিতেন। শহরের বিভিন্ন এলাকা এবং কোন কোন সময় অন্যান্য শহর হইতেও বহুলোক আসিয়া সমবেত হইতেন। রোগশয্যার এই দিনগুলিতে আগন্তুকদের ভীড় অনেকগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। হযরত মাওলানা নিজে তখন আর বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। কিন্তু এই সমস্ত আগন্তুকরা যাহারা নিজেদের কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া সমবেত হইতেন, তাহারা শুধুমাত্র মাওলানার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানিয়া বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই চলিয়া যাইবেন, এই পরিস্থিতি মাওলানা বরদাশত করিতে পারিতেন না। বরং নিয়মিত যাতায়াতকারী এই লোকগুলির এই সময়টুকুও যাহাতে দ্বীনের কাজে ব্যবহৃত হয় সেই জন্য কড়া নির্দেশ দিতেন। দ্বীনের তলব নিয়া যে লোকগুলি এখানে আসেন তাঁহাদের একটি মুহূর্ত বরবাদ করাকেও হযরত মাওলানা অত্যন্ত গুরুতর খেয়ানত বলিয়া মনে করিতেন। আগন্তুকগণকে নির্ধারিত কাজে লিপ্ত করিবার ব্যাপারে সামান্য একটু দেরী হইলেও মাওলানা আন্তরিকভাবে ক্ষুব্ধ হইতেন। তাঁহার নাজুক তবিয়ত তা বরদাশ্‌ত করিতে পারিত না।

এক জুমার রাত্রিতে মাগরিব বাদ লোকজনকে মসজিদের ছাদে বসানোর ব্যবস্থা হইল। ওয়াজ শুরু করিতে কয়েক মিনিট দেরী হইল। এরই মধ্যে পর পর দুই-তিনজনে আসিয়া খবর দিতে লাগিলেন যে, মাওলানা বলিতেছেন, "এক মুহূর্ত দেরী না করিয়া কাজ শুরু কর। এক একটি মিনিট আমার চিত্তে বোঝা

হইয়া উঠিতেছে।" যখন খবর গেল যে, ওয়াজ শুরু হইয়া গিয়াছে, তখন মাওলানা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

জীবনের শেষ সময়গুলি

দিনে দিনে স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমেই নাজুক হইতে লাগিল। এতদিন মাওলানা জামাতে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে পারিতেন, এখন কাতারের এক পাশে তাঁহার চারপায়ী আনিয়া রাখিয়া দেওয়া হয় এবং উহাতে শায়িত অবস্থাতেই তিনি নামাজ আদায় করেন।

এই সময় হযরত মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব নিজামুদ্দিনেই অবস্থান করিতেছিলেন। হযরতজীর চিকিৎসার ব্যাপারটি তিনিই দেখাশোনা করিতেন। এছাড়া মসজিদ ও সভা-সমাবেশগুলিতেও তিনিই নিয়মিত ওয়াজ-নসিহত করিতেন। হযরত মাওলানা তাঁহার উপস্থিতিতে অনেকটা শান্তি ও তৃপ্তি পাইতেন।

২৮শে জমাদিউস্‌সানী মোতাবেক ২১শে জুন তারিখে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেবও নিজামুদ্দিনে চলিয়া আসিলেন।

৬৩ হিজরীর ৩০শে জমাদিউস্‌সানী মোতাবেক ৪৪ সনের ২৩শে জুন তারিখে নূহের মাদ্রাসা মঈনুল উলুমের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভবতঃ এইটিই এই মাদ্রাসার প্রথম বার্ষিক সভা, যেখানে হযরত মাওলানা হাজির হইতে পারিলেন না।

২৩শে জমাদিউস্‌সানীর সকাল বেলায় মোটরলরী যোগে নিজামুদ্দিনের কাফেলা নূহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল। সকলে মিলিয়া মাওলানা ইউসুফ সাহেবকে কাফেলার আমির নির্বাচিত করিলেন। মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব, মাওলানা মনযুর নোমানী, মাওলানা যাকারিয়া কুদ্দুসী, মৌলবী আমীর আহমদ, অধ্যাপক আব্দুল গনী, মৌঃ সৈয়দ আজীজুর রহমান সাহেবান এবং লাখনৌর জামাতের অন্যান্য কিছু লোক এই কাফেলায় শরীক ছিলেন। পথে পথে কিছু সময় জিকির, কিছু সময় ওয়াজ-নসিহত এবং আলোচনার মধ্যে অতিবাহিত হইল। বেলা দুইটার কাছাকাছি সময় কাফেলা নূহ আসিয়া পৌছল এবং সঙ্গে সঙ্গেই জলসার কাজ শুরু হইয়া গেল। হযরত মাওলানার নিজ হাতে লাগানো বাগিচা সকলের সামনে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছিল; কিন্তু হায়! আসল বাগবানই আজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

রাতের বেলায় জলসার কাজ পুনরায় শুরু হইল। জলসার কাজ চলা অবস্থাতেই নূহের ইংরেজী স্কুলের ছাত্রাবাসে আগুন ধরিয়া গেলে সমগ্র জলসার লোকজন আগুন নিভানোর কাজে চলিয়া গেল। অনেক কষ্টে আগুন আয়ত্তে আনার পর পুনরায় কাজ শুরু হইল। রাতের বেলায় মসজিদের ঐ কোণটি যেন খাঁ খাঁ করিতেছিল, যেখানে সব সময় হযরত মাওলানার চারপায়ী লাগানো থাকিত এবং মেওয়াতের জান-নেসার ভক্তের দল পতঙ্গের ন্যায় সেখানে গিয়া ভীড় করিতে থাকিত। জুনের এই শেষভাগে প্রচণ্ড গরম পড়িয়াছিল, কিন্তু সভার সেই উত্তাপ আর অনুভূত হইল না, হযরত মাওলানার কথাবার্তা, নামাজ বাদের মর্মবিদারী কণ্ঠের দোয়া এবং তাঁহার উপস্থিতির দ্বারাই অন্যান্য সময় যা স্বাভাবিকভাবে অনুভূত হইত।

নূহ হইতে ফিরিয়া আসার পর হযরত মাওলানা কর্মীদের ডাকিয়া জলসার বিবরণ শুনিলেন। অগ্নিকাণ্ডের খবর শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ তোমরা জিকির কম করিয়াছ, তাই শয়তান সুযোগ পাইয়াছে।

একব্যক্তি এই বলিয়া একটু খুশী প্রকাশ করিলেন যে, ইংরেজী স্কুলের ইমারতে আগুন লাগিয়াছে। এই কথা শুনিয়া মাওলানা তাহাকে তখন কিছু না বলিলেও মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। পরদিন কথায় কথায় বলিয়াই ফেলিলেন যে, এই কথা শুনিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি। মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির সংবাদ শুনিয়া খুশী হওয়ার কিছু নাই।

মাওলানা ইউসুফ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জলসা হইতে তবলীগী জামাতগুলির বিদায়ের দৃশ্য মাওলানা জাফর আহমদ সাহেবকে দেখাইয়াছ কি? মাওলানা সাহেব জবাব দিলেন, জী-না। বলিলেন- বড় মারাত্মক ভুল করিয়া ফেলিয়াছ। এইটাইতো দেখার জিনিস ছিল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোবারক জামানায় মুসলমানদের অভিযাত্রী দলগুলিকে কিভাবে পাঠানো হইত।

স্বাস্থ্যের সংকটজনক অবনতি

হযরত মাওলানা ভালভাবেই অনুভব করিতেছিলেন যে, শেষ সময় ঘনাইয়া আসিতে আর বেশি দেরী নাই। নির্ধারিত সময়ের এই দিক সেই দিক হইতে পারে না। কোন কোন সময় কাজের গতি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে এই কথা

প্রকাশও করিয়া ফেলিতেন। মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব সাক্ষাৎ করিতে আসিলে বলিলেন- আপনি সময় দেওয়ার জন্য আমার নিকট ওয়াদা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও সেই ওয়াদা পূরণ করেন নাই।" মাওলানা বলিলেন, এখনতো ভয়ানক গরম, ইনশাআল্লাহ্ রমজানের বন্ধে চলিয়া আসিব এবং কিছু সময় কাজের মধ্যে ব্যয় করিব। বলিলেন- "আপনি রমজানের কথা বলিতেছেন, শাবান পর্যন্ত পৌঁছারও আশা আমি করিতে পারিতেছি না।" এই কথা শুনিয়া মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব তখন হইতেই নিজামুদ্দিনে কিছুদিন থাকিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

চৌধুরী নিয়াজ খানকে বলিলেন- "ভাই! তুমি এখানেই অবস্থান করিতে থাক, বিশ দিনের ব্যাপার, মনে হয় এর মধ্যেই এইদিক সেইদিক কিছু একটা হইয়া যাইবে।" আল্লাহর কি শান; এই কথা বলিবার ঠিক বিশ দিনের মাথাতেই হযরতজী দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছিলেন।

মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী বলেন- "আমাকে কয়েকবারই বলিয়াছেন, আমার পুনরায় সুস্থ হইয়া উঠিবার আশা নাই, তবে আল্লাহর কুদরতে তো সব কিছুই হইতে পারে।"

কখনও কখনও আবার এমন আশার কথা বলিতেন যে, শুশ্রূষাকারীগণ আশান্বিত হইয়া উঠিতেন।

চিকিৎসার পরিবর্তন

প্রথম হইতেই পাহাড়গঞ্জের হাকীম করীম বখস্ সাহেব চিকিৎসা করিতেছিলেন। মাওলানা জাফর আহমদ সাহেবের পরামর্শে হাকিমী চিকিৎসা পরিবর্তন করিয়া বাইওকেমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল। সর্বশেষে দিল্লীর প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার আব্দুল লতীফ চিকিৎসা শুরু করিলেন, কিন্তু ডাক্তার সাহেব অন্ত্রের অবস্থা পরীক্ষা করিবার পর কিছুটা নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পরীক্ষায় জটিল ধরনের পুরাতন আমাশয় ধরা পড়িল। ডাক্তার সাহেব অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ইন্‌জেকশানের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু সব কিছুই বেকার প্রতিপন্ন হইল।

হযরত মাওলানার ভাগিনেয় মাওলানা একরামুল-হাসান কান্দলবীর দায়িত্বে ছিল ঔষধ সেবন করানোর কাজ। পথ্যাদির দেখাশোনা করিতেন মৌলবী লুৎফর রহমান সাহেব। মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব এবং মাওলানা এহ্‌তেশামুল-

হাসান সাহেব সার্বিকভাবে দেখা- শোনার কাজে নিয়োজিত হইয়া ছিলেন। মৌলবী ওয়াসেফ আলী সাহেব অযু এবং নামাজের ব্যবস্থা করিতেন। চৌধুরী নওয়াজ খান, নম্বরদার মেহ্‌রাব খান প্রমুখ মেওয়াতের কতিপয় প্রবীণ ভক্ত অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। কিষণগঞ্জের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী মুহম্মদ ইউসুফ সাহেব রাতের পর রাত জাগিয়া মাথায় তৈল মালিশ করিতে থাকিতেন। হযরত মাওলানা তাঁর এই সমস্ত খাদেমগণের প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট ছিলেন। বলিতেন, আমার এই সমস্ত খাদেমগণকে তোমরা "খাদেম" মনে করিও না। প্রকৃত পক্ষে ইহারা প্রত্যেকেই "মখদুম"। শেষ সময়কাল সার্বক্ষণিক এই সমস্ত খাদেমগণ রূহানীয়াতের সীমাহীন দৌলতলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দিল্লীর ব্যবসায়ী সমাজের একটি বিরাট শ্রেণী হযরত মাওলানার অত্যন্ত ভক্ত এবং সমগ্র কর্মজীবনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন। জীবনের এই শেষ সময়টিতেও তাঁহারা অত্যন্ত ভক্তিনম্র অন্তর নিয়া বরাবর আসিয়া হাজির হইতেন। নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করিয়া পালাক্রমে সর্বক্ষণ কেহ না কেহ এখানে উপস্থিত থাকিতেন।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক বনাম দ্বীনি সম্পর্ক

দাওয়াত ও তবলীগের কাজে হযরত মাওলানা নিজের সমস্ত সত্তাকে এমনভাবে বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন যে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক বলিতে তাঁহার আর কিছু ছিল না। দ্বীনি কাজের সঙ্গে সম্পর্কের মাপকাঠিতেই তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক গড়িয়া তোলা বা রক্ষা করা সম্ভবপর হইত। কাহারও সম্পর্কে যদি জানিতে পাইতেন যে, সে দ্বীনের কাজে অংশগ্রহণ করে না শুধু মাওলানার ব্যক্তিগত গুণগ্রাহী, তবে তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন। তাহার দ্বারা কোন প্রকার খেদমত গ্রহণ করিয়াও তিনি তৃপ্তি পাইতেন না।

একদা জনৈক মেওয়াতী মাথায় তৈল মালিশ করিতেছিলেন। অল্পকিছুক্ষণ পর লোকটির প্রতি মাওলানার দৃষ্টি পড়িল। তাহাকে চিনিয়া ফেলিলেন এবং বলিতে লাগিলেন- 'তুমি তো কোন সময় তবলীগের কাজে অংশগ্রহণ কর না আমি তোমার খেদমত গ্রহণ করিব না, এখান হইতে তুমি চলিয়া যাও।'

একবার একজন বৃদ্ধ খেদমত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। হযরতজী মাওলানা মনযুর নোমানী সাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন- "দেখুন, লোকটি দীর্ঘকাল হইতে আমার সঙ্গে অত্যন্ত মহব্বতের সম্পর্ক রাখে, কিন্তু বারবার

তাগাদা দেওয়ার পরও সে তবলীগের কাজে সময় দেয় নাই। আপনি তাহাকে নিয়া গিয়া বুঝাইয়া দিন, এই কাজে অংশগ্রহণ না করিলে আমার মনে কষ্ট হয়।" মাওলানা সাহেব বৃদ্ধকে অন্যত্র ডাকিয়া নিয়া বুঝাইতে বসিলেন। বৃদ্ধ জবাব দিলেন, এইবার আমি কাজে যোগ দেওয়ার জন্য সংকল্প গ্রহণ করিয়াই এখানে আসিয়াছি। মাওলানা সাহেব খেদমতে হাজির হইয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে হযরতজী তৎক্ষণাৎ লোকটিকে ডাকাইয়া নিলেন এবং মোসাফাহা করিবার সময় আবেগে তাহার হাত চুম্বন করিলেন।

কাজের অগ্রগতি

এই সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে যে সমস্ত পত্র আসিত তাতে জানা যায়, দিল্লীর বাহিরে বহু এলাকাতেই কাজ দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছিল। যে সমস্ত এলাকায় এতদিন কাজ করা প্রায় সম্ভবপর হইতেছিল না, সেইসব স্থানেও আশাতিরিক্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে কাজ শুরু হইয়া গিয়াছিল। যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি ছিল সেই সমস্তও ধারণাতীতভাবে বিদূরিত হইতে লাগিল। চারদিকে যেন আন্দোলনের মধ্যে অপার্থিক এক নূতন প্রাণবন্যা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। হযরত মাওলানার অসুস্থতার মধ্যেই নূতন নূতন কয়েকটি এলাকায় কাজের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। মৌলবী আব্দুর রশীদ সাহেবের অনুরোধে বেশ বড় একটি জামাত ভূপাল রওয়ানা হইয়া গেল। এই জামাতে মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেবও শরিক ছিলেন।

মৌলবী আব্দুর রশীদ নোমানী এবং অধ্যাপক আব্দুল গনীর প্রস্তাব অনুসারে জামাত দুই দুইবার জয়পুর সফর করিয়া আসিল। নতুন এলাকাগুলির মধ্যে কাজের উৎসাহ-উদ্দীপনা সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল মুরাদাবাদে। সেখানকার কাজের অগ্রগতির খবর নিয়া বার বার নিজামুদ্দিনে লোক যাতায়াত করিতেছিলেন।

জীবনের শেষ মুহূর্তটি যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল, হযরত মাওলানার কাজের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ যেন ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চলিয়াছিল। তাঁহার তবিয়ত তখন এমন এক নাজুক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, একমাত্র দাওয়াতের কাজ ব্যতীত অন্য কোন কথা শুনিবার মত ধৈর্যই যেন তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। অচিন্তনীয় শারীরিক দুর্বলতা এবং তীব্র পীড়ার মধ্যে বিছানায় পড়িয়া থাকিয়াও স্বয়ং সব কাজের তদারক করিতেন। কর্মীগণকে বারবার ডাকাইয়া আনিয়া এই সম্পর্কিত বিভিন্ন নির্দেশ এবং পরামর্শ দিতে থকিতেন।

দরস, তবলীগী এজতেমা এমন কি খানার দস্তরখানায় বসিয়া তবলীগের প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন কথা আলোচিত হয় কি না, সেই খবরটুকু পর্যন্ত রাখিতেন। কখনও অন্যরূপ কোন কথা শুনিতে পাইলে অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন। লোকজনকে সর্বদা তালীম, দরস এবং জিকিরের মধ্যে মশগুল থাকিবার জন্য তাকিদ করিতে থাকিতেন। এই তাকিদ অবশ্যই শাসনের মাধ্যমে নয়, বরং উপদেশ ও উৎসাহ বাণীর মাধ্যমেই দিতেন। একবার জোহর বাদ দরসের মজলিসে যোগদানের ব্যাপারে কয়েকজন আলেমের একটু গাফলতি হইয়া গিয়াছিল। জানিতে পারিয়া এমন সূক্ষ্ম পন্থায় তা বলিয়া পাঠাইলেন যে, এতেই সকলে সাবধান হইয়া গেলেন। অনেক সময় কোন কোন বিষয়ের প্রতি বিশেষ কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য তাহাকেই ডাকিয়া সেই কাজের ফজিলত বয়ান করিবার নির্দেশ দিতেন। এর দ্বারাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে সেই কাজটির গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই দৃঢ়মূল হইয়া যাইত।

জলসার কার্যবিবরণী এবং তবলীগী কাজের সকল হাল-হকিকত শুনিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করিতেন। এক রাত্রে দিল্লীর মীর দরদ্ সড়কের জলসা শেষ হইতে হইতে রাত্র বেশি হইয়া যাওয়া কর্মীগণ রাতের বেলায় নিজামুদ্দিন পৌঁছিতে পারিলেন না। রাতের মধ্যে কয়েকবারই জিজ্ঞাসা করিলেন। সকালে লোক পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ডাকিয়া আনিয়া সব কথা শুনিবার পর শান্ত হইলেন।

শারীরিক দুর্বলতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তবিয়ত এমন স্পর্শকাতর হইয়া পড়িয়াছিল যে, নিজের কাজের কথা ব্যতীত অন্য কোন আলোচনা শুনিবার মত ধৈর্যও আর অবশিষ্ট ছিল না। একবার দরসের মজলিসে ইতিহাস বিষয়ক কোন এক বিষয়ে বিতর্ক শুরু হইয়া গেল। অনেকেই এই বির্তকে অংশ গ্রহণ করিলেন, বিতর্কমূলক এই আলোচনায় মুসলিম রাজা-বাদশাহগণের কার্যকলাপ সম্পর্কে তীব্র সমালোচনারও অবতারণা হইল। কার মাধ্যমে যে মাওলানা জানিতে পারিলেন, জানা গেল না; দেখা গেল মৌলবী মঈনুল্লাহ সাহেব পয়গাম নিয়া আসিয়াছেন; মাওলানা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, এই মুহূর্তে তোমরা আলোচনার প্রসঙ্গ পরিবর্তন কর। তকরিরে উসুল সম্পর্কে হযরত মাওলানার তাকিদ ছিল, "সব সময় অল্প কথায় নিজের বক্তব্য পেশ করিতে হইবে। কথা ওজনদার এবং তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ হইতে হইবে। ভাষণ যেন কোন অবস্থাতেই দীর্ঘ না হয়। বর্ণনা ভঙ্গী যেন হয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের বর্ণনাভঙ্গীর অনুরূপ।" তাঁহার বর্ণনারীতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে, "তিনি যেন লোকজনকে কোন একটি আগ্রাসী বাহিনীর আশু আক্রমণ সম্ভাবনা হইতে সাবধান করিতেন।"

ওয়াজের মধ্যে কিচ্ছা-কাহিনী, চুটকী-গল্প বা গজল-শেয়র শুনিবার মত ধৈর্য হযরত মাওলানার ছিল না। কখনও কোন বক্তা প্রসঙ্গ দীর্ঘ করিতে শুরু করিলে বা কৃত্রিমতার আশ্রয় নিলেই মাওলানা তাকিদ করিয়া পাঠাইতেন যে, "হয় প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা বল, অন্যথায় বক্তৃতা বন্ধ কর। বলিতেন, এখানে ওয়াজের অধিক্যের কোন প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন জলসা এবং মাদ্রাসায় তো হরহামেশাই ওয়াজ হইতেছে।"

এই কারণে অনেক সময় খাদেমগণ এমন ব্যবস্থা করিতেন যেন মাওলানার কানে মসজিদে অনুষ্ঠিত ওয়াজ-নসিহতের আওয়াজ না যায়। মাওলানার যাতে কষ্ট না হয় এবং বেচারা বক্তাও যেন তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতে সমর্থ হন।

এক জুমার সকালে বহু লোক সমবেত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কথা বলিবার জন্য মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভীকে হুকুম দিলেন। সৈয়দ সাহেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া প্রসঙ্গ একটু বিস্তৃত করিয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গেই মাওলানা নির্দেশ পাঠাইলেন– প্রসঙ্গ লম্বা হইয়া যাইতেছে। সংক্ষেপে আসল বিষয় এবং দাওয়াতের কথা পৌঁছাও।"

আসরের সময় সাধারণতঃ অনেক লোক জমিয়া যাইতেন। হযরত মাওলানা সমবেত লোকজনকে কোন না কোন উপদেশের বাণী বলিয়া পাঠাইতেন এবং তা হুবহু হাজেরানের মধ্যে শুনাইয়া দেওয়া হইত। এই দিন বিকালবেলায় হযরত মাওলানার জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। জ্বরের তীব্র দাহনে কিছুটা বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া তিনি বিছানায় পড়িয়াছিলেন। নিয়মিত মজলিসে আর কেহ কোন আলোচনা করিলেন না। হুশ ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ মজলিসে কেন কিছু বলা হইল না? সময় কেন নষ্ট করা হইল? নিবেদন করা হইল, কিছু বলিবার জন্য হুজুর তো কোন নির্দেশ দেন নাই। বলিলেন, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করা সমিচীন মনে হয় নাই। এই কথা শুনিয়া আক্ষেপের সুরে বলিতে লাগিলেন, দ্বীনি প্রয়োজনের চাইতেও কেন আমার শারীরিক অবস্থাকে বেশি গুরুত্ব দিলে। আমার কষ্টের কথা কেন চিন্তা করিলে? কেন এমন মূল্যবান সময়টুকু নষ্ট করিয়া দিলে?

কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব

এই সময়ে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি হযরত মাওলানা সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব প্রদান করিতেন। এইগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম এবং সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিতেন এলেম এবং জিকিরের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং অবিরাম তাকিদ করিবার কাজে। যেন তাঁহার প্রবর্তিত তবলীগের তাহরিক দেশের আর দশটি রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনের ন্যায় কয়েকটি নিয়ম-পদ্ধতির এবং আনুষ্ঠানিকতার প্রাণহীন একটি প্রতিষ্ঠান-সর্বস্ব ব্যাপারে হইয়া না দাঁড়ায়। হযরত মাওলানা এই চিন্তায় যেন সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন। সব সময় কর্মীগণকে এলেম চর্চা এবং বেশি বেশি জিকির করিবার অভ্যাসের প্রতি তাকিদ করিতে থাকিতেন। বারবার নিজে বলিতেন এবং অন্যদের দ্বারা বলাইতেন যে– এলেম ও জিকির আমার এই আন্দোলনের দুইটি চাকার ন্যায়। দুইটি চাকাই সমভাবে না চলিলে এই গাড়ী বেশি দূর চলিবে না। দুইটি পাখার ন্যায়, যার একটিরও অনুপস্থিতিতে আকাশে উড্ডয়ন সম্ভবপর হইবে না। এলেমের জন্য জিকির এবং জিকিরের জন্য এলেমের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব খুব বেশি। জিকির ব্যতীত এলেম গোমরাহী, আর এলেম ব্যতীত জিকির একটি ফেতনাবিশেষ। আর এই দুইটি জিনিস ব্যতীত আমার এই আন্দোলন জড়বাদী আন্দোলনে পর্যবসিত হইতে বাধ্য হইবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল, মুসলমানদের মূর্খ ও পশ্চাদপদ শ্রেণীটির প্রতি সীমাহীন দরদ এবং তাহাদের উদ্ধার চিন্তা। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা এবং তবলীগের আলো বিস্তার করিবার সীমাহীন আকাঁক্ষা। এই আকাঁক্ষায় উদ্বেলিত হইয়া হযরত মাওলানা একটি চমকপ্রদ রাস্তা দেখাইলেন। মসজিদের পাশেই পথের ধারে শামিয়ানা টানাইয়া সেখানে হুক্কা-পানির ব্যবস্থা করাইলেন। অনুরূপ আর একটি শিবির দূরে অন্য এক পথের ধারে নির্মাণ করাইলেন। মেওয়াত এবং দিল্লীর প্রবীণ কর্মীগণকে নির্দেশ দিলেন, যেন পথচলা মেহনতী গরীবমুসলমানগণকে ডাকিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, হুক্কা-পানি দ্বারা যেন তাহাদের খাতির-যত্ন করা হয়। তারপর কথায় কথায় তাহাদের কলেমা ঠিক আছে কি না তা জিজ্ঞাসা করা এবং শিক্ষা গ্রহণ করিবার প্রতি যেন আগ্রহান্বিত করিয়া তোলার চেষ্টা করা হয়। হযরত মাওলানা তাঁহাদের এই নতুন পরিকল্পনাটির প্রতি এমন আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, বার বার সেই সমস্ত শিবিরে লোক পাঠাইয়া খুঁজ-খবর নিতেন, কাজ ঠিকমত চলিতেছে কি না, তা জানিতে চেষ্টা করিতেন। এই সময় আজমীরের ওরশ চলিতেছিল। দূর-দূরান্ত হইতে দেহাতী মুসলমানগণ হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়ার মাজার জেয়ারত করিবার জন্য আসিয়া সমবেত হইতেছিলেন। দীর্ঘপথ চলা শ্রান্ত-ক্লান্ত গ্রামের লোকেরা পথিপার্শ্বে ঘনছায়া ঠাণ্ডা পানি এবং তাজা হুক্কা দেখিয়া একটু বিশ্রামের আশায় বসিয়া পড়িত। হুক্কা সেবনের অবসরে দক্ষ মোবাল্লেগগণ তাঁহাদের কাজ সারিয়া নিতেন। কোন কোন সময় এই ধরনের লোকজনকে অনুনয় করিয়া আনিয়া কিছুক্ষণের জন্য বসাইতেন এবং সামান্য বিশ্রামের ফাঁকে তাঁহাদের কথা বলিতেন। এই পন্থায় শতশত জাহেল মুসলমানের কানে দ্বীনের পয়গাম পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। আল্লাহ মালুম, এই প্রক্রিয়ার দ্বারা তাঁর কত বান্দার পক্ষে হেদায়েত পাওয়ার পথ খুলিয়া গিয়াছে।

কোন কোন সময় ফজরের আগেই কিছু সংখ্যক আলেমকে হযরত মাওলানা মথুরাগামী রাজপথের মোড়ে গাড়োয়ান এবং উট চালকদের মধ্যে দ্বীনের কথা প্রচার করিবার জন্য পাঠাইয়া দিতেন।

তৃতীয় বিষয়টি ছিল জাকাত দেওয়া এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিবার সহীহ্ তরিকা সম্পর্কে উপদেশ। হযরত মাওলানার জীবনে এই ফরজটির ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করিবার সুযোগ বেশি ছিল না। কিন্তু জীবনের শেষ সময়ে এই সম্পর্কে খুব বেশি লক্ষ্য দিয়াছিলেন। এই সময়ে সম্পদশালী ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকদের ভীড় বেশি হইত। হযরত মাওলানা বারবার নিজে বলিতেন বা অন্যকে দিয়া জাকাত প্রদান করিবার গুরুত্ব বর্ণনা করিতেন। তিনি জোর দিয়া বলিতেন, অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় প্রত্যেকের পক্ষেই জাকাতের প্রতিও সমান গুরুত্ব প্রদান করা কর্তব্য। নিজেই উদ্যোগী হইয়া জাকাতের প্রকৃত হকদার খুঁজিয়া বাহির করা উচিত। প্রকৃত হকদারকে জাকাত প্রদান করিবার সময় এইরূপ ধারণা করা উচিত যে, যিনি গ্রহণ করিতেছেন, তিনি একটি ফরজ পালন করিবার ব্যাপারে তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন। মাওলানা জাফর আহমদ সাহেবসহ অন্যান্য আলেমগণ দ্বারা এই বিষয়ের উপর বারবার তকরিরও করাইলেন।

চতুর্থ বিষয়টি হইতেছে চিঠি-পত্রের প্রতি গুরুত্ব আরোপ। তাকিদ ছিল, প্রতিদিন ফজর বাদ তবলীগী কাজসংক্রান্ত প্রত্যেকটি পত্র যেন হাজেরীনকে পড়িয়া শুনানো হয়। পত্রগুলিতে কাজ সম্পর্কিত যে সমস্ত সমস্যার উল্লেখ থাকে সেই সম্পর্কে সমবেত লোকদের নিকট হইতে যেন পরামর্শ গ্রহণ করা

হয়। পত্রগুলি শুনানোর পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত তকরির করিতে হইত। বলা হইত যে, এই সমস্ত চিঠি-পত্র আপনাদিগকে এই উদ্দেশ্যে শুনানো হইতেছে যেন আপনারা সকলেই পত্রোল্লিখিত সমস্যাগুলি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন, নিজেদের সমস্যাবলী সম্পর্কে চিন্তা করিবার একটি অভ্যাস যেন আপনাদের মধ্যে গড়িয়া উঠে। এই পর্যন্ত আপনারা নিজেদের দুনিয়াদারী সমস্যা সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা করিবার ব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, এখন হইতে দ্বীনি সমস্যাদির ব্যাপারেও চিন্তা করিবার অভ্যাস গড়িয়া তুলুন। সাধারণতঃ পত্রগুলিতে যে সমস্ত সমস্যার উল্লেখ থাকিত, সেই সম্পর্কে দিল্লী ও মেওয়াতের পুরাতন অভিজ্ঞ মোবাল্লেগগণের পরামর্শ প্রয়োজন হইত। তাঁহারা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের রাস্তা বাতাইতেন। এই সব আলোচনার মধ্যেও নতুনদের জন্য শিক্ষা করিবার অনেক কথা থাকিত।

কোন কোন পত্রে জামাতের কার্যবিবরণী উল্লিখিত হইত। কর্ম পন্থার মধ্যে কোথাও কোন গলতি দেখা গেলে, তা সংশোধন করিয়া জবাব দেওয়া হইত। অনেক স্থান হইতে নতুন জামাত প্রেরণের অনুরোধ আসিত, সেই পত্রের মর্মানুযায়ী আমিরগণ সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন।

প্রথম প্রথম এই সমস্ত পত্র হযরত মাওলানার উপস্থিতিতেই শুনানো হইত, শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার পর একটু দূরে বসিয়া পরামর্শ করিবার ব্যবস্থা হইল। মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী এই দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। যে কোন সময় তিনি খেদমতে হাজির হইলেই মাওলানা সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করিতেন, আজকের ডাকে কি কি গুরুত্বপুর্ণ খবর আছে এবং উল্লিখিত সমস্যাদি সম্পর্কে হাজেরানে-মজলিস কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন? মাওলানার বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোথাও কোন ত্রুটি দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা সংশোধন করিয়া দিতেন। এইভাবেই হযরত মাওলানা তাঁর জীবদ্দশাতেই ভবিষ্যতে জামাতের কার্যক্রম, স্বাধীনভাবে চলিবার পথ তৈয়ারী এবং সেই সম্পর্কে বাস্তব অনুশীলনেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে কয়েকটি জলসার এন্তেজাম

মাওলানা জাফল আহমদ সাহেবের উপস্থিতিটুকু পরিপূর্ণরূপে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে দিল্লীর ব্যবসায়ীগণকে তাকিদ দিয়া হযরত মাওলানা পরপর কয়েকটি জলসার ব্যবস্থা করাইলেন। ফলে দিল্লীর কর্মীগণের উদ্যোগে

হাওজওয়ালী মসজিদ, কালে মসজিদ, বানিয়া সরাই মসজিদ, কাসসাবপুরা মসজিদ এবং জামেয়া-মিল্লিয়াতে মাহফিলের আয়োজন করিয়া মাওলানা জাফর আহমদ সাহেবের দ্বারা তকরির করানো হইল।

মীর দরদ সড়কে প্রতি রবিবারে তবলীগী এজতেমা এবং গাশ্‌তের নিয়মিত কার্যক্রমের ব্যাপারে হযরত মাওলানা খুব বেশি উৎসাহী ছিলেন। এই এজতেমাকে তিনি নয়াদিল্লীর তবলীগী মারকাজ বলিয়া মনে করিতেন। অধিকাংশ সময় মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, মৌলবী মুঈনুল্লাহ্ নদভী এবং মাওলানা ওয়াসেফ সাহেবের উপর এই এজতেমায় বয়ান করিবার দায়িত্ব পড়িত।

জনসমাগম বৃদ্ধি

এই সময় নিজামুদ্দিনে আগন্তুকগণের ভীড় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক এক সন্ধ্যায় দুই হইতে তিনশত লোক সেখানে খানা খাইতেন এবং মসজিদে অবস্থান করিতেন। মসজিদ এবং মেহমানখানাগুলি লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। সামান্য একটু দেরী হইলেই আর মসজিদে নামাজের জন্য স্থান পাওয়া কিংবা রাত একটু বেশি বাড়িয়া গেলে কোথাও বিছানা পাতার মত জায়গা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া পড়িত। কিন্তু যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এত লোকের ভীড়, তাঁহার পক্ষে তখন শুধু দুই চোখ মেলিয়া আগন্তুকগণের চেহারা দেখা ছাড়া আর কিছু করিবার এমন কি ভালভাবে কথা বলিবারও শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। যাঁহার দস্তরখানায় এত লোকের ভীড়, তাঁহার পক্ষে সামান্য আহার গ্রহণ করাও অসম্ভব হইয়া পড়িল। দ্বীন শিক্ষা করিবার এই আগ্রহ, দরসের এই মাহফিল, জিকির-আজকারের এই গুঞ্জরন, শেষ রাত্রের এই আহাজারি, এই সবকিছুই যাঁহার বদৌলতে তাঁহার হায়াতের চেরাগ যেন তখন ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল।

মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরীর আগমন

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব মাজাহেরুল উলুমের ছবকের কিছুটা এন্তেজাম করিয়া আসিবার উদ্দেশ্যে সাহারানপুর চলিয়া গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী সাহেবকে সঙ্গে আনিলেন। হযরতজী হযরত রায়পুরীকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

বারবার শায়খুল হাদীস সাহেবকে দোয়া দিতে লাগিলেন; কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

হযরত রায়পুরীর সঙ্গে তাঁহার ভক্ত ও জাকেরগণের একটি জামাতও আসিয়াছিল। ইহাদের উপস্থিতিতে নিজামুদ্দিনের পরিবেশ আরও গুলজার হইয়া উঠিল।

ভুল খবর

হযরত মাওলানার অসুস্থতা উদ্বেগজনক অবস্থায় উপনীত হইয়া গিয়াছিল। দিল্লীর ভক্তগণ সবসময় যেন কান সজাগ রাখিতেন। প্রত্যেকদিন কেহ না কেহ আসিয়া কুশল সংবাদ নিয়া যাইতেন। রাত্রে যাঁহারা অবস্থান করিতেন, সকালে শহরে পৌঁছিয়া অন্যান্যদিগকে খবর পৌঁছাইয়া দিতেন। এমনি সময়ে একদিন আল্লাহ্ মালুম কি করিয়া যেন চারিদিকে এই মর্মে খবর ছড়াইয়া পড়িল যে, হযরত মাওলানা আর নাই। দেখিতে দেখিতে শহর হইতে নিজামুদ্দিন পর্যন্ত তাঙ্গা মোটর এবং লরীর কাতার লাগিয়া গেল। চারিদিক হইতে টেলিফোনের পর টেলিফোন আসিতে শুরু করিল। দ্রুত পাল্টা খবর ছড়াইয়া দেওয়ার পরও দেখিতে দেখিতে কয়েক হাজার লোক সমবেত হইয়া গেলেন। মাওলানা মনযুর নোমানী সাহেব লোকজনকে মসজিদের সম্মুখস্থ গাছ-গাছড়ার নীচে একত্রিত করিয়া ভাষণ দিলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) কোরআন শরীফের যে আয়াতটি পাঠ করিয়া শোক সন্তপ্ত সাহাবায়ে-কেরামকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, মাওলানা সাহেব সেই একই আয়াত পাঠ করিয়া লোকজনকে শান্ত করিলেন। মাওলানা সাহেব সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, আজ এই খবর মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলেও একদিন তা অবশ্যই সত্যে পরিণত হইবে। কেননা, প্রত্যেক মানুষের জন্যই মওতের সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। সুতরাং আজ পর্যন্ত যাহারা হযরত মাওলানার দাওয়াতের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহাদের পক্ষে এখনও লক্ষ্য করা উচিত- হযরত মাওলানা চিরকাল থাকিবেন না, দিল্লীর মানুষকে চিরদিন আল্লাহর পথে ডাকিবার সময় তাহার হইবে না।

শেষ কয়েকটি দিন

ধীরে ধীরে চেরাগ নিভিয়া আসিতেছিল। ওফাতের দুই-তিন দিন আগে বৃষ্টি হইয়া আবহাওয়া আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। অসুস্থ মাওলানা শরীরে খুব গরম অনুভব

করিতেন। তাই অধিকাংশ সময় চারপায়ী মসজিদের ছেহেনে আনিয়া রাখিতে হইত। ফলে সবার অলক্ষ্যে ঠাণ্ডা লাগিয়া নিউমোনিয়ায় আক্রমণ করিয়া বসিল। কিন্তু প্রথম প্রথম তাহা কেহ টের পাইলেন না। খুঁজ যখন পাওয়া গেল, তখন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে।

নিভিয়া যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে চেরাগ যেমন হঠাৎ তীব্র আলো ছড়ায় ঠিক তেমনি শেষ সময় হযরত মাওলানার মস্তিষ্ক যেন অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত কাজ করিতেছিল। একের পর এক উপদেশ এবং কাজের ভবিষ্যত সম্পর্কিত ওসিয়ত করিয়া চলিয়াছিলেন।

৮ই জুলাই রাত বারটার পর মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীকে কাছে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মাওলানা মসজিদের এলাকার বাহিরে রাস্তায় পায়চারী করিতেছিলেন। খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন। বিছানার নিকটে গিয়া মুখের কাছে কান লাগাইলেন। অনুভব করিলেন, এই প্রথমবারের মত আওয়াজে কম্পন অনুভূত হইতেছে। মাঝে মাঝে যেন আওয়াজ ডুবিয়া যাইতেছে। অতিকষ্টে কয়েকবার থামিয়া থামিয়া কথা শেষ করিলেন। লোকজনকে সবসময় আল্লাহ্র জিকিরে নিমগ্ন থাকিবার তাকিদ করিলেন। হযরত রায়পুরীর মজলিসে নিয়মিত বসিবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

৯ই জুলাই রাতের বেলায় এক ব্যক্তির নাম নিয়া বলিতে লাগিলেন, সে কি তাহার এলাকায় গিয়া কাজ শুরু করিতে তৈয়ারী হইয়াছে? উপস্থিত সকলে নিবেদন করিলেন- জী হ্যাঁ, তিনি সম্মত হইয়াছেন। হযরত মাওলানাকে খুশী করিবার জন্য বলিলেন, লোকটি বেশ প্রভাবশালী, কাজ শুরু করিলে তাঁহার কথায় বেশ প্রভাব পড়িবে। হযরত মাওলানা জবাব দিলেন- "হ্যাঁ আল্লাহ্ওয়ালাদের কথায় সব সময়ই প্রভাব পড়িয়া থাকে।"

কথা কয়টি বলিতে বলিতেই কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর একটু হুশ হইলে বলিতে লাগিলেন, 'মৌলবী মুহম্মদ তৈয়্যব (রামপুরী), মৌলবী জহিরুল হাসান এবং অধ্যাপক হাফেজ ওসমানের উপস্থিতিতে বাগপতে একটি জলসা করিতে পারিলে ভাল হয়।'

১০ই জুলাই সন্ধ্যায় একটু হুশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উলামাগণের উদ্দেশ্যে বলিলেন- "প্রত্যেক আলেমের পক্ষেই তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হওয়া দরকার।"

১১ই জুলাই সকাল বেলায় যমযমের পানি পান করিতে করিতে হযরত

ওমরের (রাঃ) সেই দোয়া মুখ হইতে বাহির হইল, " আয় আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদতের সৌভাগ্য এবং তোমার নবীর (সাঃ) শহরে মৃত্যুদান করিও।"

এই দিনই এক ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে দ্বীনের এই দাওয়াত তাহার নিজের এলাকায় লোকজনের মধ্যে প্রচার করিয়াছে কি না? আর এই কাজের জন্য সে কিরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে?

একই দিন হাফেজ ওসমান সাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন। হযরত মাওলানা পয়গাম পাঠাইলেন, হাফেজ ওসমান আমার স্নেহভাজন, তাহার যেন বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়।

শেষ সময় চিকিৎসকগণ অভিমত ব্যক্ত করিলেন যে, হযরতের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিঃসার হইয়া গিয়াছে, শুধু আধ্যাত্মিক শক্তি বলে এখনও তিনি টিকিয়া রহিয়াছেন। এর অবস্থা নিজেদের সঙ্গে তুলনা করিবেন না। যা কিছু আপনারা দেখিতেছেন, তা শারীরিক শক্তি নয়, শুধু আত্মার শক্তির উপরই তিনি এখনও কথাবার্তা বলিতেছেন। এই অবস্থা সাধারণ লোকের পক্ষে অনুধাবন করিয়া উঠা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

১২ই জুলাই বুধবার দিন শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব, মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী সাহেব এবং মাওলানা জাফর আহমদ সাহেবের নামে এই পয়গাম পাঠাইলেন যে, "আমার লোকজনদের মধ্যে হাফেজ মকবুল হাসান, ক্বারী দাউদ, মাওলানা এহতেশামুল হাসান, মাওলানা মুহম্মদ ইউসুফ, মাওলানা এনামুল হাসান এবং মাওলানা সৈয়দ রেজা হাসানের উপর আমার পূর্ণ আস্থা রহিয়াছে। যে সমস্ত লোক আমার নিকট বায়আত করিতে আসে তাহাদিগকে উপরোক্ত যে কোন একজনের হাতে বায়আত করিতে বলুন।"

ইহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিবার পর খেদমতে হাজির হইয়া নিবেদন করিলেন, মাওলানা ইউসুফ সাহেব সর্বদিক দিয়াই যোগ্যতম ব্যক্তি। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দেস দেহলভী (রাহঃ) "আল কাওলুল্ জামীল" কিতাবে খেলাফতের যে সমস্ত শর্ত উল্লেখ করিয়াছেন, মা-শা আল্লাহ! তার সব কয়টিই মাওলানা ইউসুফ সাহেবের মধ্যে রহিয়াছে। তিনি যোগ্য আলেম-আবেদ এলেমের খেদমতেই সব সময় লিপ্ত থাকেন। সুতরাং হযরতের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে তাঁহার কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

জবাব দিলেন- "তোমাদের সকলের যদি এই সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এর মধ্যেই বরকত দিবেন। প্রথমে অবশ্য আমার মনে কিছুটা দ্বিধা ছিল। এখন পূর্ণ এত্মিনান্ হইয়া গেল। আশা করা যায়, ইনশাআল্লাহ্ আমার পরেও কাজ যথারীতি চলিতে থাকিবে।"

সন্ধ্যার দিকে একবার এরশাদ করিলেন, "যদি কেহ আমার হাতে বায়আত করিতে চাও, তবে এখনই তা করিতে পার।" কিন্তু দুর্বলতার কথা লক্ষ্য করিয়া তা মুলতবী রাখা হইল।

বিদায়ের রাত্রি

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন শেষ যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন-

কাল কি বৃহস্পতিবার? লোকেরা জবাব দিলেন, জী হাঁ। বলিলেন, আমার পরিধানের কাপড়গুলি ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখ কোন না-পাকী লাগিয়া নাই তো? যখন জানিতে পাইলেন যে, কোন না-পাকী নাই, তখন আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

একবার চারপায়ী হইতে নামিয়া অজু করিয়া নামাজ পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু খেদমতকারীগণ বারণ করিলেন।

জামাতের সঙ্গেই নামাজ শুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রস্রাবের বেগ হওয়াতে এশার জামাত শেষ করিতে পারিলেন না। পরে অজু করিয়া হুজরায় দ্বিতীয় জামাতে এশা আদায় করিলেন।

নামাজের পর বলিলেন, আজকের রাত্রে সকলে প্রাণ ভরিয়া আল্লাহর জিকির করিতে থাক। আজকের রাত্রে আমার সঙ্গে সেই সমস্ত লোক যেন থাকে, যাহারা শয়তান এবং ফেরেশ্তার প্রভাবের পার্থক্য বুঝিতে সক্ষম।

মাওলানা এন্আমুল-হাসান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন- ঐ দোয়াটি না কিভাবে পড়িতে হয়? আয় আল্লা! তোমার ক্ষমা..........।

তিনি পূর্ণ দোয়াটি উচ্চারণ করিয়া শুনাইলেন-

"আয় আল্লাহ! তোমার ক্ষমার পরিধি নিঃসন্দেহে আমার গোনাহর পরিধির চাইতে অনেক প্রশস্ততর। তোমার রহমত আমার আমলের তুলনায় অনেক বেশি আশা করা যায়। আমি তাই আশা করি।"

দোয়াটি স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বার বার তাহা পড়িতে থাকিলেন। এক

সময় বলিলেন– "আমার ইচ্ছা হয়, নিচে নামিয়া গোসল করিবার পর প্রাণ ভরিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়ি।"

রাত্রি বারটার দিকে হঠাৎ করিয়া অবস্থা খারাপ হইয়া গেল; ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিলেন। তারপর হইতে বার বার শুধু যবান হইতে আল্লাহু আকবার আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল।

শেষ রাত্রের দিকে মাওলানা ইউসুফ সাহেব এবং মাওলানা একরামুল-হাসান সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সম্মুখে আসার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "ইউসুফ! আস, মিলিয়া লও!! আমি তো চলিলাম!! এরপর ফজরের আজানের আগেই এই মহান পুরুষের জীবন-বায়ু নির্গত হইয়া পরম প্রিয় মাওলার সঙ্গে গিয়া মিলিত হইল।

যে মহান কর্মী পুরুষ, ক্লান্ত মুসাফির! জীবনে কখনও এক মুহূর্ত আরাম করিবার সুযোগ পান নাই, মুহূর্তের মধ্যেই তিনি গভীর নিদ্রার কোলে যেন ঢলিয়া পড়িলেন।...........ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন!!

ফজর বাদ উদ্বেলিত অশ্রু বন্যার মধ্যে মাওলানা মুহম্মদ ইউসুফ সাহেবের মাথায় হযরতজীর পাগড়ী পরাইয়া তাঁহার শূন্য আসনে বসানো হইল।

কাফন-দাফন

শেষ বিদায়ের প্রস্তুতি শুরু হইল। যোগ্য উলামাগণ প্রত্যেকটি সুন্নত, মোস্তাহাব পর্যন্ত আদায় করিয়া অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে গোসল দিলেন।

ছেজদার অঙ্গুলিতে খুশবু লাগানোর সময় আজীবন সাথী হাজী আব্দুর রহমান বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন– "পেশানীয় মধ্যে উত্তমরূপে আতর লাগাও! এই পেশানী ঘন্টার পর ঘন্টা ছেজদায় পতিত হইয়া থাকিত।"

খবর সঙ্গে সঙ্গেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সকাল হইতে না হইতেই পঙ্গপালের ন্যায় লোকজন আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিরাট জনতায় নিজামুদ্দিনের পথ-ঘাট ছাইয়া গেল। যে জনতাকে হযরত মাওলানা জীবৎকালে কখনও বেকার বসিয়া থাকা পছন্দ করিতেন না, মুহম্মদ ইউসুফ এবং শায়খুল হাদীস সাহেবের নির্দেশে তাহাদিগকে মসজিদের সম্মুখস্থ ময়দানে সমবেত করা হইল। হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেব এবং হযরত মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব দীর্ঘক্ষণ ধৈর্যধারণ করিবার জন্য উপদেশ দিতে থাকিলেন।

মানুষের স্রোত ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছিল। জোহরের সময় পর্যন্ত কোথাও আর তিল ধারণের স্থান রহিল না। অতিকষ্টে জানাযা মসজিদের বাহিরে গাছ-গাছড়ার নিচ পর্যন্ত নিয়া আসা হইল। হযরত শায়খুল হাদীস সাহেব জানাযার নামাজ পড়াইলেন। খাটিয়ার সঙ্গে কাঠ সংযুক্ত করিয়াও লোকের আরজু পূর্ণ করা গেল না। শেষ পর্যন্ত অনেক সাধ্য-সাধনার পর মসজিদের দক্ষিণ দিকে মহান পিতা ও বড় ভাইয়ের পার্শ্বে দ্বীনের এই মহা আমানত মাটির বুকে স্থাপন করা হইল। সূর্যাস্তের আগেই দ্বীনের এই সূর্য মাটির বুকে মুখ লুকাইলেন। যে সূর্যের আলোকে লক্ষ প্রাণের অন্ধকার বিদুরিত হইয়াছে, যে সূর্যের উত্তাপে লক্ষ্য প্রাণের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, দ্বীনের সেই মহান সূর্য চিরদিনের জন্য মাটির কোলে গিয়া আশ্রয় নিল!!

সন্তানাদি

হযরতজী মাত্র একপুত্র মাওলানা মুহম্মদ ইউসুফ এবং এক কন্যা (শায়খুল হাদীস সাহেবের স্ত্রী) রাখিয়া যান। খোদ শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব একাধারে তাঁহার প্রিয় ভাইয়ের সন্তান, সাগরেদ এবং জামাতা। হযরতজী (রাহঃ) সারা জীবনের সাধনায় যাহাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, হযরত শায়খুল হাদীস সাহেব তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য একজন।

বিরাট একদল উলামা, আওলিয়া ও জান-নেসার দ্বীনে সৈনিক ছাড়াও মেওয়াতের লক্ষ লক্ষ দ্বীনদার মানুষ হযরতজীর স্মৃতি হিসাবে আজও বাঁচিয়া রহিয়াছেন। শেষ বিদায়ের কয়েকদিন আগেই একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "অন্যান্যরা কিছু বিশিষ্ট লোক তৈয়ারী করিয়া রাখিয়া যান। আমি আমার পিছনে গোটা একটি দেশ রাখিয়া যাইতেছি।"

বিরল ব্যক্তিত্ব

হযরতজীর বাহ্যিক অবয়ব ছিল, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ, হালকা-পাতলা শরীর অপেক্ষাকৃত খাট আকৃতি, কিন্তু অত্যন্ত তেজস্বী ও কর্মদক্ষ। ঘন কৃষ্ণ দাড়িশোভিত আকর্ষণীয় চেহারা এবং উন্নত ললাট হইতে প্রখর ব্যক্তিত্বের চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইত। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দাড়ির কয়েকটি চুল মাত্র সাদা হইয়াছিল। চেহারার মধ্যে সব সময় যেন গভীর চিন্তার ছাপ দেখা যাইত। যবানে সামান্য কিছুটা জড়তা ছিল, তবে এমন আবেগ-উদ্বেলিত ভাষায় কথা

বলিতেন যে, জড়তার বাঁধন কাটাইয়া তাঁহার ভাষণ-বক্তৃতা যেন ফোয়ারার পানির ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকিত। ইবাদত-বন্দেগীতে অসাধারণ নিমগ্নতা এবং কর্মক্ষেত্রে অকল্পনীয় দৃঢ়তার একটা সুস্পষ্ট স্বাক্ষর যেন তাঁহার চেহারা হইতেই ফুটিয়া বাহির হইত। প্রথম দর্শনেই যেকোন লোকের মনে তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণ না জন্মিয়া পারিত না। আল্লাহর এই মহান ওলী জীবনে কোনদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। বাহ্যিক কোন ভোগ-বিলাস তাঁহাকে কোন দিন স্পর্শ করিতে পারে নাই। সাহাবায়ে-কেরামের যে জীবন-সাধনার দাওয়াত তিনি সারা জীবন দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সেই আদর্শ যেন মূর্ত হইয়া উঠিত।

সংসার জীবনের প্রতি আকর্ষণ বা বাহ্যিক ধন-সম্পদের প্রতি সাধারণ খেয়াল দেওয়ার মত সময়ও তিনি কখনও পান নাই। দ্বীনের জন্য হৃদয় ভরা দরদ নিয়া তিনি যেন চেরাগের সলিতার মত সব সময় জ্বলিতে থাকিতেন। কলিজার খুন ঢালিয়া আল্লাহর দ্বীন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পথহারা মুসলমান সমাজকে পথের সন্ধান দেওয়াই ছিল তাঁহার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। সব সময় এই এক চিন্তাতেই ডুবিয়া থাকিতেন।

নিজের জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির রাস্তায় কুরবান করিয়া দিয়া তিনি সংসারী হইয়াও সংসারত্যাগী দরবেশের জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

বিংশ শতকের এই ব্যাপক গোমরাহীর যুগে তিনি যে আবেগের সঙ্গে ক্ষীণবিশ্বাসী মুসলিম সমাজের মধ্যে ঈমান ও একীনের দাওয়াত দিয়াছেন, নিজের জীবনের আচার-আচরণে এবং দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়া তিনি তার বাস্তব নমুনা পেশ করিয়া গিয়াছেন।

ভাল কথা বলিবার মত লোকের অভাব নাই। কিন্তু প্রত্যেকটি উপদেশকে প্রত্যয়-দৃঢ় অন্তর লইয়া প্রথমে নিজের জীবনে বাস্তবায়িতকরণ এবং তারপর অন্যের কাছে তা বলিবার মত ব্যক্তিত্ব খুব কমই তো খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াস সাহেবের জীবনে আদর্শ এবং জীবন যাত্রার মধ্যে কোন ফাঁক খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সমকালীন পৃথিবীতে এমন মহান কর্মী পুরুষের অস্তিত্ব সত্য সত্যই বিরল!!